পঞ্চম অধ্যায়

কি দেবদৃশ্য সন্ন্যাস

১

মর্টন স্কুল, ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। চারতলায় শ্রীম নিজকক্ষে খাটে বসা। এখন সকাল নয়টা। আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ সাল, শুক্রবার।

বেলুড় মঠ হইতে আনন্দ আসিয়াছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম অতি স্নেহভরে আদর করিয়া তাঁহাকে পাশে একটি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আনন্দ চেয়ার টানিয়া শ্রীম-র কাছেই বসিলেন।

শ্রীম মঠের সংবাদ লইলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর শ্রীমকে আনন্দ ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। শ্রীমর-ই আদেশে এই সাধু নিত্য ডায়েরী লেখেন। তিনি বলেন, মঠের সংবাদ মানে অমৃতত্ত্বের সংবাদ।

ডায়েরীপাঠ সুরু হইল।

বেলুড় মঠ। ১লা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। ১৭ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল। আজ মঠে কল্পতরু উপলক্ষ্যে অনেক সাধু, ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুরঘর প্রচুর পরিমাণে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইবে। আজ মহাপুরুষ মহারাজের একটি অপরূপ ভাব। আনন্দ স্বামীজীর ঘর হইতে প্যাসেজে আসিয়া শুনিলেন, শ্রীমহাপুরুষ উচ্চস্বরে বলিতেছেন, 'ওঁ নমো রামকৃষ্ণায়... জয় রামকৃষ্ণ, জয় ঠাকুর কল্পতরু... সচ্চিদানন্দ রামকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রামকৃষ্ণ ... অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব।' আনন্দ ভাবিতেছেন, আজ বুঝি উনি রামকৃষ্ণময়।

শ্রীমহাপুরুষ ঘরে খাটে বসিয়া আছেন। এখন পৌনে আটটা। তিনি বলিতেছেন, একবার এই সময় এলাহাবাদে রয়েছি এক মাড়োয়ারীর বাড়িতে। গঙ্গার উপর বাড়ি। খুব উঁচু ঘর। ওরা একটা গান গাইতো — 'রাম সুধারে...।' ওরা খুব ভক্ত লোক। সাধুসেবা করে।

বেলুড় মঠ। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। আজ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ,

শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৩৬ সাল। শীতকাল।

স্বামীজীর ঘরের প্যাসেজ।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আফিস ঘর হইতে বাহির হইয়া প্যাসেজে ঢুকিতেছেন। সামনে দাঁড়ানো একজন সাধু। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিতেছেন, কি আনন্দ, কেমন আছ? সাধু প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন, ভাল আছি মহারাজ। মহাপুরুষ বলিলেন — আহা, ভাল থাক। তাঁর কৃপায় ভাল থাক।

শ্রীমহাপুরুষ দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় যাইতেছেন। গায়ে ফিকে গেরুয়া র‍্যাপার জড়ান। মাথায় কানঢাকা গরম টুপি। পায়ে মোজা ও কার্পেটের চটি। টলিতে টলিতে চলিতেছেন। পশ্চাতে সাধু। বলিতেছেন, চলতে পারছি না। সাধু বলিলেন, অসুখ — আবার বুড়ো শরীর, তাই। মহাপুরুষ উত্তর করিলেন বালকের মত নিজের কষ্ট প্রকাশ করিয়া — না, বুক খারাপ তাই টলতে হয়।

একটি অসুস্থ সাধুর মনের রূপরেখা শ্রীম শুনিতেছেন।

এই সাধুটির শরীর খারাপ। ডাক্তারদের কথা শুনিয়া মনও খারাপ হইয়াছে। তিনি বিগত কিছুদিন হইতে তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি ভাবিতেছেন, এ সময় চারদিক চেয়ে সংসারে কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যার ছায়ায় দাঁড়ান যায়। সঙ্ঘের আশ্রয় গুরুদেব। তিনিও বার্ধক্যে ও রোগে বালকস্বভাব হয়ে গেছেন। তিনি অপরের সেবার অধীন। কয়দিনই মনে হয়েছে, মহাপুরুষ মহারাজকে বলি ঠাকুরকে বলতে, যাতে আমার মনে জোর দেন, শক্তি দেন। আমার বেশী বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত করেন। আর যাতে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকতে পারি তাই করে দেন।

শরীর তো পড়েই গিয়েছে। তবে একেবারে invalid (অকর্মণ্য) না হয়ে যতটুকু পারা যায় তাঁর সেবা করা। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে কত কষ্ট। কয়েকজন সাধুকে দেখেছি এই কষ্ট ভোগ করতে। আবার ঝোঁকের মাথায় বেশী খেটে খেটে অসুখ করার জন্য দোষী নিজেকেই হতে হয়। এটাও আমার নিজের ব্যাপারেই দেখেছি। এখন দাঁড়াই কোথায় — midway (মধ্যপন্থা) কোথায় — অত্যধিক খাটা ও একেবারে না খাটার? নিজের বুদ্ধিতে এই মিডওয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এটা বুঝেছি, পথ —

তাঁর শরণাগত হওয়া।

ঠাকুর বলতেন, দোষেগুণে মানুষ। তেমনি সঙ্ঘ। সঙ্ঘে থাকতে গেলে সকলে সকলের কষ্ট বোঝে না। আবার বাইরে গেলেও তো কত কষ্ট! কত বিষয়ী লোকের সঙ্গে থাকতে হয়। অপরের কাছে হাত পাততে হয়।

তা ছাড়া শরীর যতদিন আছে ততদিন প্রকৃতির বশেই কাজ কিছু করতেই হবে, যেখানেই থাকি না কেন? তবে সঙ্ঘের আশ্রয়ে থেকে কাজ করাই ভাল। যা হয় হবে।

প্রথমে আমার অন্তরের ভাব বুঝতে না পেরে অল্প কাজের জন্য সমালোচনা করলেও পরে ক্রমে সকলে আমার ভাব জানতে পারলে আর কিছু বলবেন না।

সাধুজীবন যে উত্তম জীবন এতে কিছুমাত্র ভুল নাই। তাই নিয়েই জীবনধারণ করতে হবে। রোগ থাকে থাকুক। এরই মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখপানে চেয়ে থাকতে হবে। সাধুজীবন ও শরণাগতি এই দুই-ই আশ্রয়।

শ্রীম — হাঁ, পথ তো একই, তাঁর শরণাগত হওয়া। অন্য পথ নাই। 'নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়' — এটি ঋষিদের কথা। বেদের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত। বেশ বিচারটি ধরেছ। দেখলে, ঠাকুর কেমন ভক্তের সঙ্গে সর্বদা থাকেন। তিনিই তো তোমার মনে প্রবেশ করে এই সদ্‌বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি সর্বমঙ্গলময়। এটা বুঝে সংসারে থাকা, এতেই অর্ধজীবন্মুক্ত।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। সকাল সাতটা। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। মাথায় টুপি, গায়ে র‍্যাপার জড়ান। সামনে একটি স্টুলের উপর হুঁকা, নলটা মুখের কাছে, এক একটা টান দিতেছেন। আর প্রণামরত সাধু ব্রহ্মচারীদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন — ভাল আছ?

স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ ও অপর একটি সাধু মহাপুরুষের ঘরে প্রণামের পর দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শর্বানন্দ পশ্চিম-দক্ষিণের জানালারা কাছে। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ তাহার উত্তরে টেবিলের গায়ে, স্বামী নির্বাণানন্দ খাটের দক্ষিণে। আর একটি সাধু দরজার কাছে দাঁড়ান।

মঠের কতিপয় সাধু স্বতন্ত্র একটি সঙ্ঘ করিয়াছেন কলিকাতায়। তাহার কথা হইতেছে। ঠাকুরের একজন সন্তান উহার প্রধান।

শ্রীমহাপুরুষ তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া বলিলেন — দল করেছে — হেঁ হেঁ হেঁ। বুড়ো বয়সে কত কি করছে। মহামায়ার লীলা বোঝা যায় না।

একজন সাধু — অমুক অমুক তার মেম্বার হয়েছেন।

মহাপুরুষ — হোক না, কত লোক তো কত কি করছে। তবে তোমরা ঠাকুর, স্বামীজী, মা, মহারাজ — এঁদের সূত্র ধরে ধরে যাও — নিজের কর্তব্য করতে করতে যাও। করুক না — কতো লোক তো কত করছে।

স্বামী শর্বানন্দ — অমুক অত mean (হীনবৃত্তি) নন। নিজের ভাবে আছেন। কিন্তু ইনি দেখছি revenge (প্রতিশোধ) নিচ্ছেন।

মহাপুরুষ (উত্তেজিত হইয়া) — আরে এ কি করছে? মহামায়া, মহামায়া। বুড়ো বয়সে এতো রস গজগজ করছে।

স্বামী শর্বানন্দ — অমুক ওতে যোগদান করেন নাই।

মহাপুরুষ — সে বুদ্ধিমান ছোকরা। ও যায় নাই, ওর মন নাই। আরে রাম, ও তো সংসারীদের কাজ। সাধন নাই, ভজন নাই, ত্যাগ তপস্যা নাই। এ তো সংসারীদের কাজ।

স্বামী নির্বানানন্দ — অমুক মহারাজ অনেকটা ভাল। ক্রমে ক্রমে বুঝছেন।

মহাপুরুষ — তাই ভাল। ও বুঝে শুনে সব কাজ করে। বুদ্ধিমান ছোকরা।

সন্ধ্যার আরতি হইয়া গিয়াছে। এখন সাড়ে ছয়টা।

শ্রীমহাপুরুষ দোতলার ছোট ঘরে বসিয়া আছেন খাটের উপর, পশ্চিমাস্য। স্বামী শংকরানন্দ নিচে বসা। তিনি বিকালে কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়াছেন। এখন চলিয়া যাইবেন।

স্বামী শংকরানন্দ (দীনভাবে) — মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। আর মনটা যেন ভাল থাকে, স্থির থাকে।

মহাপুরুষ — হ্যাঁ বাবা, প্রাণ থেকে এই বলছি ঠাকুরকে — ঠাকুর, মন ভাল করে দাও, অচলা ভক্তি দাও। হিমালয়ের ন্যায় ভক্তি হয়। দৃঢ়া ভক্তি হোক। ঠাকুর, মনটা ভাল করে দাও, শরীরটা ভাল করে দাও।

একটি সাধু এই দৈবী আশীর্বাণী শুনিতেছেন প্যাসেজে দাঁড়াইয়া, স্বামীজীর ঘরের সম্মুখে। তিনি ভাবিতেছেন, আহা, কি প্রাণখোলা প্রার্থনা, কি কৃপা! সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে কল্যাণচিন্তা করছেন, সমগ্র মনপ্রাণে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

২

পরের দিন সকাল সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে উপবিষ্ট, গরম র‍্যাপার জড়ান। আনমনে হুঁকার নলটা টানিতেছেন। মন অন্তর্মুখীন। শান্তিপাঠ করিতেছেন —

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।

ঘরের ভিতরে আছেন বড় হীরেন মহারাজ, নাঞ্জাপ্পা ও আর একজন সাধু।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও পাদুকা স্পর্শ করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন — গুরুদেব, মনটা ভাল করে দাও, শক্তিশালী করে দাও।

পাঠ চলিতেছে।

মঠের পুরাতন বিল্ডিং-এর দ্বিতলের বারান্দা — সম্মুখে গঙ্গা। অপরাহ্ন তিনটা। মঠের সাধুদের মিটিং বসিয়াছে। আজের মিটিং-এর উদ্দেশ্য, মঠের সাধুদের শ্রীমহাপুরুষ বলেন, তাঁহারা যেন ওয়ার্কিং কমিটির কথা মান্য করেন সকলে। তুরীয়ানন্দ মহারাজের জীবন মোটেই আলোচনা হয় নাই, যদিও ইহা উপলক্ষ করিয়াই সকলে সমবেত হইয়াছেন। আজ ১ লা জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, পৌষের শুক্লা চতুর্দশী।

শ্রীমহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে বসা। পিছনে স্বামীজীর ঘরের বারান্দার দরজা। বাম হাতে প্যাসেজ। সাধুরা মেঝেতে সতরঞ্জির উপর বসিয়াছেন। কেহ খোকা মহারাজের ঘরে। কেহ বা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিছনে গঙ্গা।

উপস্থিত — স্বামী শংকরানন্দ, শর্বানন্দ, মাধবানন্দ, ওঁকারানন্দ, শাশ্বতানন্দ, নিখিলানন্দ, দেবেশানন্দ, ঈশানানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি

সাধুগণ।

একজন সাধু বক্তৃতার নোট লইতেছেন। উহা প্রকাশিত হয় উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত ও বেদান্ত কেশরীতে। প্রকাশিত হইলে দেখা যায় উহাতে কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাই আর একজন সাধুর ডায়েরী হইতে নিম্নে ঐ অংশ সংযোজন করা হইল।

শ্রীমহাপুরুষ — হরি মহারাজকে শ্রীমহারাজ বলতেন শুকদেবতুল্য। সারা জীবন তপস্যা করেছেন। শেষে তবুও লোকের উপকার হলো (অসুখে সেবার সময়)।

স্বামী মাধবানন্দ (শ্রীমহাপুরুষের প্রতি) — কাজ করতে চায় না কেউ, ধ্যান করতে চায়। কাজ করতে গেলে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। তাই কাজে যেতে চায় না।

শ্রীমহাপুরুষ (করুণামাখা স্বরে, অনুরোধের ভাবে) — তাদের বলতে হয় একটু তলিয়ে দেখতে। এ কাজ আরম্ভ হয় তাঁর (ঠাকুরের) শরীর থাকতে, কাশীপুর বাগানে। সেখানেই কাজের আরম্ভ — তাঁর সেবায়।

এখানে যারা এয়েছে সকলেই জ্ঞানী। তাদের বেশী কিছু বলতে হয় না। আমার তো এই ধারণা। আমরা দেখেছিও তাই। তা আমি তো তাঁর চরণতলে পড়ে রয়েছি। যদি আমাকে বলতে বল, আমিও বলতে পারি।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রশ্নের উত্তরে) — প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কাজ করতে হয়। শেষে নিজেই বুঝতে পারে যে কাজেতেও তাঁর সেবা হয়।

কিন্তু বাবা, সাধন ভজন চাই। সাধন ভজন ছেড়ে দিলে কি কাজ করবে? দিনে দুই তিনবার অন্ততঃ এই বিচার করবে, আমি আর তিনি (ঠাকুর), ঈশ্বর আছেন। শেষে আমিও নাই — কেবল তিনি। ঐ সময় মঠফট, কাজকর্ম সব উড়িয়ে দেবে।

স্বামী শর্বানন্দ — কাজে ধ্যান জপের কাজ হয় না? কাজ থেকে ধ্যান জপ বড় কি?

স্বামী ওঁকারানন্দ — নিশ্চিত। সমাধিলাভের অব্যবহিত কারণ যখন ধ্যান, তখন ধ্যান বড় বই কি? বস্তা টেনে টেনে কে কখন সমাধিলাভ করেছে?

স্বামী মাধবানন্দ — হাঁ, অন্তরঙ্গ সাধন আর বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রীমহাপুরুষ পূর্বোক্ত কথোপকথন শুনিয়াই উল্লিখিত রূপ উপদেশ দেন।

স্বামী নিখিলানন্দ — মহারাজ, সঙ্ঘের কথা ঠাকুরের আদেশ। সঙ্ঘ তো, যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে আছেন, কিম্বা যাঁরা ট্রাস্টি — তারাই তো?

শ্রীমহাপুরুষ (ইহার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া) — হাঁ, কাজ করতে হলে একজনের কথা তো শুনতে হয়। না হলে কাজ হয় না।

আমায় যদি বল তো আমি এ্যাপিল করে বলবো। আমি দেখেছি, বুঝিয়ে বললে কেউ কখনও অবাধ্য হয় না। সকলেই জ্ঞানী।

স্বামী শংকরানন্দ — মহারাজ পুরীতে থাকার সময়, কেদারবাবাকে ধ্যান জপের কথায় খুব encourage (উৎসাহিত) করতেন।

পরদিন সকাল। মহাপুরুষের ঘর। স্বামী শর্বানন্দ ও নির্বাণানন্দের প্রবেশ। তাঁহারা প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

মহাপুরুষ (স্বামী শর্বানন্দের প্রতি) — অমুক কাল এসেছিল।

স্বামী শর্বানন্দ — হাঁ, আলাপ হয়েছিল।

নির্বাণানন্দ — অনেক toned down (নরম) হয়েছেন।

মহাপুরুষ — মা অবস্থার ভিতর ফেলে শিক্ষা দেন। অবস্থার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেন।

বেলুড় মঠ। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। মহাপুরুষ দক্ষিণের দরজার গোড়ায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। শীতকাল, তাই পা দুইটি একটা গরম র‍্যাপারে ঢাকা। ডান দিকে একটি ছোট স্টুলের উপর চিঠির রাশি, উনি পড়িতেছেন। সাধু ও ভক্তরা সংসারজ্বালায় জর্জরিত হইয়া দুঃখকষ্ট নিবেদন করেন চিঠিতে। তিনি পড়িয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধুরা সাধন ভজন ও কর্মসম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রার্থনা করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ একটি মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়া গৃহের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভদ্রমহিলা স্বামী অভেদানন্দের ভক্ত। মহাপুরুষ ঘরে আসিতে বলিলেন। মেমটি চেয়ারে বসিয়া আছেন খাটের পশ্চিমে দক্ষিণাস্য, মহাপুরুষের ডান হাতে। প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন মেমসাহেব।

Lady Disciple — What are the troubles?

Mahapurusha — Old age — it's about eighty! Then asthma, blood pressure, weak heart — these are the troubles, these are the complaints!

Lady Disciple — Who suffers — the body or the soul?

Mahapurusha — Certainly the body.

Lady Disciple — Who takes birth and who dies?

Mahapurusha — The body! The soul never suffers, nor dies.

No, I never suffer. I have no birth, no death!

This body has come. It has lived. It must go — not me. I am ever-living.*

একটি সাধু স্বামীজীর ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছেন। তিনি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া একবার এই দেবদৃশ্য দেখিলেন। আর ভাবিতেছেন, একেই বলে অবতারের পার্ষদ! ঈশ্বর দর্শন হলে সকলেই জীবন্মুক্ত। কিন্তু মনে হয়, অবতারের পার্ষদদের শক্তি বেশী। তাঁরা জীবন্মুক্ত তো বটেই — আবার নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। অত অসুখের ভিতরও মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন — শরীর ভুগছে, আমি নই। আমি অজর অমর নিত্য সনাতন।

একটি সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কথোপকথন শুনিয়া ভাবিতেছেন

---

* ভক্ত মহিলা — কি অসুখ?

মহাপুরুষ — বার্ধক্য, বয়স প্রায় আশি। তার উপর হাঁপানী, রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা — এই সব রোগ, এই সব উপসর্গ।

ভক্ত মহিলা — কে ভুগছে — শরীর, কি আত্মা?

মহাপুরুষ — নিশ্চয়, শরীরেরই এই ভোগ।

ভক্তমহিলা — কার জন্ম, — কারই বা মৃত্যু?

মহাপুরুষ — শরীরের। আত্মার জন্ম-মরণ নাই। আত্মা অজ (জন্ম নাই যার) অজর অমর — নিত্য শাশ্বত। নিশ্চয়, আমি আত্মা। আমার জন্মমরণ নাই।

এই শরীরেরই জন্ম। শরীরটাই এত দিন বেঁচে আছে। এরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আমার নয়। আমি অজ নিত্য শাশ্বত।

— এই তো দেববাণী। আমি আত্মা, আমার সুখদুঃখ নাই, জন্মমরণ নাই ঠাকুর শ্রীগুরুর মুখ দিয়া এই মহাবাণী শুনাইলেন আমারই জন্য, আমার দুর্বল মনকে সবল করিতে। মনরোগের এই মহৌষধ — আমি আত্মা — অজর অমর অভয়।

ডায়েরী পাঠ শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন।

শ্রীম — হাঁ, এই তো আসল কথা — আমি অজর অমর অভয়। এই ভাবটি ধরেই সংসারের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যাঁর ধারণা যত সুদৃঢ় তাঁরই শান্তি সুখ আনন্দ তত অবিচলিত। এক কথায়, এটাই জীবের অমৃতত্বলাভ। এটাই ভারতের সনাতন সংস্কৃতি।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাড়ে সাতটা। মহাপুরুষ খাটে বসা পশ্চিমাস্য। অনেক সাধু প্রণাম করিতে আসিতেছেন। ঘরে স্বামী শাশ্বতানন্দ, আরাবিয়ার মতি মহারাজ, ব্রহ্মদাস, বামদেবানন্দ, আনন্দ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছেন। আজ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সোনারগাঁয়ের আশ্রমের একটি সাধু প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া মহাপুরুষের কাছে সন্ন্যাসসংস্কার প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্দীপনার সহিত ধর্মোপদেশ দিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুদের প্রতি) — আজকাল দেখছি, ছোকরাদের মধ্যে একটা ভাব উঠেছে সন্ন্যাস নেওয়া। যেন সন্ন্যাস নিলেই সব হলো।

আরে, ঠাকুরের আশ্রয় যারা নিয়েছে তারা ও-রকম হবে কেন? তিনি অন্তর্যামী। তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস হবে, জ্ঞান হোক, সমাধি হয়ে যাক্। এই তো ঠাকুরের ছেলেদের হওয়া উচিত।

ও তো আছেই। সন্ন্যাসী কত তো রয়েছে। মন্ত্র আওড়ালে, আর সন্ন্যাস হয়ে গেল?

নিয়ম আছে, বিরজা হোম রোজ করতে হয়। জিনিসপত্র না দিয়েও হয় মনে মনে। তা করে কই? একটু মন্ত্র পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। ও কি ঢং উঠেছে? তাঁর ধ্যান জপ পাঠপূজা — এতে মন ডুবে যাক। ওই

তো কাজ। তাঁ’তে ভক্তি হোক, এই চাই।

ঠাকুর তো ঐ সন্ন্যাসের কথা কখনও আমাদের বলতেন না। সন্ন্যাসের মত ভেতর তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন কৃপা করে। বলেছিলেন, ‘ধ্যান জপের সময় গেরুয়া পরে করো। অন্য সময় তুলে রেখে দিও।’

তিনি এমন সন্ন্যাসের কথা আমাদের একবারও বলেন নি। স্বামীজী এই সব করেছেন — এই আমাদের বাইরের সন্ন্যাস।

ঠাকুর-ভক্ত যাঁরা তাঁদের এ সবের দরকার নাই। তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস কিসে হয়, কিসে ভালবাসা হয় এই হলো আসল জিনিস।

তাঁর আশ্রিত যাঁরা, তাঁদের আশ্রয়ে থেকে এ সব কি ভাব! কোথায় ভক্তি বিশ্বাস হবে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হবে, দিবানিশি প্রার্থনা করবে — তা না, এই সন্ন্যাস চাই।

গেরুয়া — ভিক্ষার জন্য এর দরকার হয়। তা পরলেই হলো। অনেকে তো পরছে।

স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রবেশ। ইনি মহাপুরুষের সেক্রেটারী।

মহাপুরুষ (স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রতি) — ইনি সন্ন্যাস চাইছেন। সংস্কৃত জানে না, অর্থ বোঝে না, লেখাপড়া জানে না, কি হবে এতে!

স্বামী গঙ্গেশানন্দ কিছু উত্তর করিলেন না। মহাপুরুষও নীরব। আর একজন সাধু সন্ন্যাস প্রার্থনা করিবেন আজই। কেন না দুই দিন পরই স্বামীজীর জন্মোৎসব। তখন সন্ন্যাসসংস্কার হইবে। এই সাধুকে এক বৎসর পূর্বে শ্রীমহাপুরুষ লিখিয়াছিলেন, তুমি এদিকে আসিলেই সন্ন্যাস দিব। তিনি মাদ্রাজে ঠাকুরের সেবাকার্য করিতেন তখন। এখন তিনি মঠে আসিয়াছেন। কিন্তু শরীরটি খারাপ করিয়া আসিয়াছেন মাদ্রাজ হইতে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীন। তাই তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন সন্ন্যাসের প্রার্থনা করিবেন কি না।

ইতস্ততঃ করিবার তাঁহার আরও এক কারণ আছে। তিনি মনে মনে বিচার করিতেছেন, শ্রীমহাপুরুষ তো আমার গুরু, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি স্বেচ্ছায়ই লিখিয়াছিলেন সন্ন্যাস দিবেন। এখন তিনি স্বেচ্ছায়ই তো বলিবেন নিজেই, আমার সন্ন্যাস লইবার প্রয়োজন থাকিলে। তাই তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছে সন্ন্যাস চাহিতে। তিনি ভাবিতেছেন, যিনি ভালবাসেন, যিনি

অতি আপনার জন, তাঁহার কাছে চাহিব কি করিয়া? আমার যাহাতে কল্যাণ হইবে তাহা তো তিনি নিজেই ডাকিয়া দিবেন।

মহাপুরুষ মহারাজের করুণার শেষ নাই। বাবুরাম মহারাজের শরীর ত্যাগের পর উনি যখন মঠের ব্যবস্থাপক হন তখন হইতেই তাঁহার করুণার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। পড়ার সময় কিছু দিন মঠে না আসিলে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন, আর মঠে আসিতে বলিতেন। তখন মনে হইত, তিনি কত বড়, কত মহান! সামান্য লোক আমি, তাহারই জন্য কত ভাবনা। অহেতুক কৃপা। তিনি সত্যকার আপনার লোক।

এক সময় প্রস্তাব করিলেন, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস লইয়া গিয়া ওখানে (শ্রীম-র কাছে) থাক না। সেই দিনে আইনকানুনের অত কড়াকড়ি ছিল না।

এই কয় বছর পূর্বেও, তখন মঠে ছিলাম তিন মাস ধরে। দেখা হইলেই বলিতেন, 'Get ready for Gerua...' (গেরুয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও)। কিন্তু আমি রাজী হই নাই। তাই বলি, তাঁহার কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন কি? তিনি যে আপনার জন — গুরু, পিতামাতা সব। যা কল্যাণকর তাহা তো নিজেই করেন। তাঁহার অযাচিত কত কৃপা।

একদিকে এই সব বিচার। অপর দিকে সাধু ভাবিতেছেন, বেদের কথা, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের নিকট সন্ন্যাস ভিক্ষা করার কথা। শাস্ত্রে আছে, ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।’

সাধুর আরও ভয় হইতেছে, শরীর এই আছে, এই নাই। তাহাতে আবার রোগের আক্রমণ হইয়াছে। যদি চলিয়া যায় শরীর। কিংবা আরও অসমর্থ হইয়া পড়ে — তাহা হইলে তো আমার আর সন্ন্যাস হইল না।

সন্ন্যাস চাওয়া কি, না চাওয়া — এই দ্বন্দ্ব সাধুর ভিতর চলিতেছে। স্বামীজীর উৎসবের দিনটি যতই নিকটবর্তী হইতেছে ততই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। সাধু নিশ্চয় করিলেন — সন্ন্যাস প্রার্থনা করিবেন আজই।

সাধু আরও বিচার করিলেন, সংসারী মানুষ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের নিকট সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য প্রার্থনা করে। আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমার পরমার্থ পিতার নিকট সন্ন্যাসভিক্ষা। ত্যাগ চাহিতেছি, সংসারভোগ

নহে — ত্যাগ! তিনি সন্ন্যাসী, আমি তাঁহার সন্তান। আমি তাঁহার পবিত্র ঐশ্বর্য চাহিতেছি — ছিন্নবস্ত্র কৌপীন। ইহাতে সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। এখন আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি প্রার্থনা পূর্ণ না-ও করিতে পারেন। হয়তো অসুস্থ শরীরে চাহিলে বিরক্ত হইবেন, তিরস্কার করিবেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি? পিতামাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলে তো পরম কল্যাণ সাধিত হয়। সাধু দৃঢ়নিশ্চয় করিলেন, সন্ন্যাস চাহিবেন। আর চাহিলে মহাপুরুষ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, ইহাও নিশ্চয় করিয়া বুঝিলেন। সাধু এই স্থির করিয়া গুরুভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন।

একজন বলিলেন, বেশ তো চেষ্টা করে দেখুন না। আর একজন বলিলেন রহস্য করিয়া, কৈকেয়ীর মত এ সময়ে চেয়ে বসুন 'সত্যরক্ষা'। (মহাপুরুষ পূর্বে বলিয়াছিলেন নিজেই চিঠিতে, সন্ন্যাস দিবেন এদিকে আসিলে)। আর একজন বলিলেন, হাঁ, তিনি তো লিখেছিলেন, দিবেন। এখন তো সামনাসামনি এসেছেন। চেয়ে দেখুন না। আর একজন বলিলেন, শরীর যদি আরও খারাপ হয়, কিংবা চলে যায়? এখনই চান।

তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত বন্ধুগণের উপদেশের সহিত একমত হওয়ায় সাধু স্থির করিলেন, আজই রাত্রিতে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিব। মহাপুরুষ যখন আহারান্তে ঘরে বসিয়া থাকেন সেই সময়ই শুভক্ষণ।

সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেল। মহাপুরুষ বারান্দা হইতে প্রথম আফিস ঘরে গেলেন। তারপর নিজকক্ষে। নৈশ আহার সমাপ্ত হইয়াছে। এখন খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। রাত্রি পৌনে দশটা। সেবক রমেন খাটের উত্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। আর স্বামী দেশিকানন্দ আপন কথা নিবেদন করিতে আসিয়া মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

একজন সাধু মহাপুরুষের ঘরের বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সব দর্শন করিতেছেন। এইবার 'দুর্গা' বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আর খাটের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ শির নিচু করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। মুখ তুলিতেই সাধু নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর জন্মোৎসবে আমার সন্ন্যাস নিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া উহা প্রদান করুন। এই আমার ভিক্ষা।

মহাপুরুষ বলিলেন, এখন শরীরটা খারাপ। ঔষধ খাচ্ছ। পরে নিলেই

হবে। শরীরটা একটু ভাল হয়ে যাক।

সাধু নিজের আসনে চলিয়া গেলেন। স্বামীজীর ঘরের নিচের ঘরে তাঁহার আসন। আসনে বসিয়া সাধু ভাবিতেছেন, মহাপুরুষ অন্তরে নিশ্চয় সুপ্রসন্ন। শরীর অসুস্থ, তাই ভাবনা। সন্ন্যাসের উপবাসাদিতে রোগ বাড়িয়া না যায়, এই চিন্তা। সাধুর মন প্রশান্ত। তিনি প্রসন্ন।

শ্রীম (ডায়েরী পাঠ শুনিতে শুনিতে) — It is a sight for the Gods to see — কি দেবদৃশ্য! আহা, এ আদর্শ কোথায় আছে সংসারে অমন সমুজ্জ্বলরূপে! সর্বত্যাগের সম্মান সমগ্র জগতের মধ্যে এ দেশে, এই ভারতে অদ্বিতীয়। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ' — বেদের কথা। জগৎ যখন ভোগে ডুবে ছিল, ভারতীয় ঋষিগণ তখন এই মহাসত্য আবিষ্কার করেছিলেন।

সংসারভোগ ত্যাগের পর ঈশ্বর। ঠাকুর বলতেন আগে ঈশ্বর, পরে সব। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য।

এই ত্যাগব্রতের জন্য এক থাক লোক ব্যাকুল। তাই তো গুরুর নিকট চাইছেন সন্ন্যাস এই সাধু। চাইছেন সর্বত্যাগব্রত। অসুস্থ শরীর, কিন্তু গ্রাহ্য নাই। সংকল্প — শরীর যায় যাক্, সন্ন্যাস চাই। কেহ ভোগের জন্য পাগল, কেহ ত্যাগের জন্য পাগল। যেমন এই সাধুটি, যেমন নচিকেতা।

ঠাকুর আসায় এই ত্যাগব্রত আরও অধিক সমুজ্জ্বল হয়েছে। ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি। মাটির একটা ক্ষুদ্র ঢেলাও একস্থান থেকে উঠিয়ে অন্যস্থানে তিনি নিতে পারেন নাই। টাকা ছুঁলে হাত আড়ষ্ট হয়ে যেত, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। কোথায় আছে এ আদর্শ, এই দেবদৃশ্য!

তাই তো ভক্তদের বলি, নিত্য মঠে যেতে। ওখানে যে ত্যাগের খনি! ওখানে এলে গেলে তবে ধাত ঠিক থাকবে।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীর পূর্ব দিন। ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। মহাপুরুষ নিজের খাটে বসা। এখন সকাল সাতটা। একটি সাধু

আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — কেমন আছ, বাবা?

সাধু — আজ্ঞে, ভাল আছি মহারাজ।

মহাপুরুষ (আশীর্বাদ করিয়া) — ভাল থাক বাবা, ভাল থাক। এই ভাল থাকার জন্যই সব ছেড়ে এসেছ এখানে। আনন্দে থাক, খুব আনন্দে থাক। সংসারে এ আনন্দ নাই। এ আনন্দের মূল ঠাকুর, শ্রীভগবান। নরকলেবরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তোমরা আমরা সকলে তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, তাঁর সেবক। স্বামীজী তাঁর প্রধান সেবক। আজ স্বামীজীর জন্মোৎসব। জয় প্রভু, জয় প্রভু।

বেলা নয়টা। মহাপুরুষ মহারাজ মঠের দ্বিতলের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। আনন্দময় ভাব। মাঝে মাঝে স্বামীজীর ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, যুক্ত করে। বলিতেছেন, "জয় স্বামীজী, জয় দয়াময়। প্রণাম প্রণাম।"

স্বামীজীর ঘরের সেবককে দেখিয়া বলিলেন, সন্ন্যাস তো তোমায় কয় বছর পূর্বেই দিয়েছি এই মঠেই, ঠাকুরঘরে in spirit (সত্যিকার)। আসল সন্ন্যাস ঐ। আন্তরিক সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস। ঠাকুর ভক্তদের ঐ সন্ন্যাস দিতেন। ভিতর ফাঁক করে দিতেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সব সন্ন্যাসী — তা গৃহেই থাকুক, বা গৃহত্যাগ করুক। তাঁদের ভিতর সব লাল করে দিতেন। একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে যারা আসে আন্তরিক, তারাই আপনজন। এই অন্তরঙ্গগণ সবই সন্ন্যাসী — সংসারী কেউ নয়।

মহাপুরুষ টলিতে টলিতে একটু বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণ। পুনরায় স্বামীজীর ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘরের সেবকের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ — তোমায় তো লিখেছিলাম যখন দক্ষিণে ছিলে — 'তোমার ভিতরে সন্ন্যাস হয়ে গেছে। বাইরের সন্ন্যাসও হয়ে যাবে যখন এদিকে আসবে।' এখন তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে, ঔষধ খাচ্ছ। উপবাসাদির অত্যাচারে আরও খারাপ না হয়ে যায়, তাই ভাবনা হচ্ছে।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, এখন কেমন আছ?

সেবক — অনেকটা ভাল।

মহাপুরুষ — কেন হঠাৎ অত অসুখ হলো?

সেবক — কাজের অতিরিক্ত পরিশ্রম। তার উপর আবার pox (বসন্ত) তাতেই কাবু করে ফেলেছে।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, হয়ে যাক্ বাইরেরটাও। একবার হয়ে গেলেই হলো। এটা তো বাইরের পরিচয় মাত্র। আসল সন্ন্যাস আন্তরিক সন্ন্যাস। ওটাতো আগেই হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাও হয়ে যাবে কালই।

হাঁ বাবা, তোমার ভিতরে জ্ঞান ভক্তি খুব বেড়ে যাক্ — আমি এই আশীর্বাদ করছি। ঠাকুরের চিন্তায় ডুবে যাও। ঠাকুরই সচ্চিদানন্দ, ঠাকুরই পরমাত্মা, ঠাকুরই পরমব্রহ্ম — যা সন্ন্যাসের সার। এসব তাঁর নিজের মুখের কথা, আমাদের কথা নয়। তাঁর জীবনও তাই। সর্বদা পরমব্রহ্মে লীন হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনের এদিকটার চিন্তায় ডুবে যাও। এটাই সত্যিকার সন্ন্যাস।

সাধু সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রথা, সন্ন্যাসাদি শুভকর্মের পূর্বে মহাত্মাগণের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করা। একজন মহাত্মা বলিলেন, খুব আনন্দের কথা, সন্ন্যাস হবে। এ বিষয়ে গুরুর শুভেচ্ছাই প্রধান। তুরীয় আশ্রমে গুরুশিষ্য সম্পর্কই সার। (রহস্য করিয়া) তবে শরীর অসুস্থ। অসুখ বেড়ে গেলে কিন্তু গঙ্গায় ফেলে দেব। এই বলিয়া আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন।

অপর সাধুগণও কেহ কেহ শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শুভকার্য শীঘ্র হয়ে যাক। সন্ন্যাসে গুরুর আশীর্বাদই প্রধান। এটা গুরুশিষ্যের ব্যাপার।

একজন আইনকানুন-রসিক বলিলেন, নিজের দায়িত্বে নিতে পারেন। প্রেসিডেন্টের prerogative (অতিরিক্ত অধিকার) রয়েছে। উনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। সন্ন্যাস তো automatic-ই (আপনা আপনিই) হয়ে যায়।

আর একজন সাধু এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কি অদ্ভুত কথা! সন্ন্যাস আবার অপরের দায়িত্বে হয় নাকি? ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর

আশীর্বাদ, আর যে সন্ন্যাস নিবে তার আন্তরিক ইচ্ছা — এইগুলিই তো সন্ন্যাসের মুখ্য উপকরণ!

Automatic (আপনা আপনি) সন্ন্যাস আবার কিরূপ? সন্ন্যাসী কি মেশিনে (যন্ত্রে) তৈয়ার হয়? একজনের আন্তরিক ইচ্ছা না থাকলে কি অপরের ইচ্ছায় সন্ন্যাস নেওয়া যায়? নিলেও সে সন্ন্যাস স্থায়ী হবে কেন? যে নিবে তার ইচ্ছাই প্রধান। সারা জীবনের জন্য একটা উচ্চ আদর্শে ব্রতী হওয়া। সে অপরের ইচ্ছায় কি করে হতে পারে? ব্রতীর স্বেচ্ছাই মুখ্য উপকরণ সন্ন্যাসে।

অপর কয়েকজন সাধুও এই মত সমর্থন করিলেন। আর অতি আনন্দে সকলে শুভেচ্ছা প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্'। আর একজন সাধু সামবেদীয় শান্তিপাঠের এক চরণ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন —

"তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি মহোৎসব। ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার, পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী। বেলুড় মঠে নানা মঠ ও আশ্রম হইতে সাধুরা আসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। বিরাট ভোগ ও দরিদ্র-নারায়ণসেবার আয়োজন চলিতেছে একদিকে। আর একদিকে পূজা হোম ও সন্ন্যাসের আয়োজন। ছয় জন আজ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবেন। ব্রতীগণ মঠের কাজ হইতে তিনদিনের জন্য ছুটি লইয়াছেন। স্বামীজীর ঘরের কাজের ভার লইয়াছেন স্বামী গোপালানন্দ।

ব্রতীগণ সারাদিন উপবাসী। মধ্যাহ্নে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে মঠের উত্তর পার্শ্বস্থিত ই. আই. রেলের পাম্পিং স্টেশনে। একজন পুরোহিত যথাযোগ্য সকল কার্য করিয়াছেন। মুণ্ডিতমস্তক ব্রতীগণ নিজের পায়ে নিজের পিণ্ড দান করিলেন। পূর্ব পুরুষগণের পিণ্ডদান করিলেন আগে। আজ হইতে ইঁহারা কোনও বৈদিক কর্মের অধিকারী হইতে পারিবেন না। তাঁহারা অত্যাশ্রমী-ব্রত গ্রহণ করিবেন।

মঠে বহুলোক সমাগত। দর্শক, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ। মধ্যাহ্ন ভোগের পর কয়েক হাজার লোক বসিয়া আনন্দে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ

করিলেন।

সন্ন্যাসের যাবতীয় ব্যবস্থার ভার লইলেন একজন। আর একজন মঠের বাঁশঝাড় হইতে কঞ্চির দণ্ড কাটিয়া দিলেন।

একজন সাধুর শরীর অসুস্থ। তিনিও সন্ন্যাস লইবেন আজ। শ্রীমহাপুরুষের সকল দিকে লক্ষ্য। তিনি সেবককে বলিলেন, তাকে বলে এসো কিছু ফল মিষ্টি দুধ খেতে। ইনি রাত্রে সাড়ে আটটায় স্বামীজীর ঘরের কিছু ফল মিষ্টি গ্রহণ করিলেন।

ব্রতীগণ বিশ্রাম করিতেছেন, নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, আজ শরীর, মন, আত্মা শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পিত। সংসারে আমার কেহ নাই, একমাত্র ভগবান ছাড়া। সত্যকার সন্ন্যাস সমাধিস্থ, পরমব্রহ্মে লীন হইয়া থাকা। সে অবস্থায় জগৎ নাই — কেন না স্বতন্ত্র 'আমি' নাই। 'আমি' থাকিলে জগৎও আছে। ক্ষুদ্র 'আমি' লবণপুত্তলিকাটি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়া প্রকৃত-স্থল পরমব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন। সকলের এ অবস্থা লাভ হয় না — এই উচ্চ অনুভূতি। নির্বিকল্প সমাধিলাভ সকলের জন্য নয়। লোকোত্তর মহাপুরুষ ঈশ্বরকোটি অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামানবেই সম্ভব। ইহা দুর্লভ। সাধারণ লোকের পক্ষে ঐ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বুদ্ধিবৃত্তিসহায়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করা ঐ অবস্থা লাভের জন্য ক্রমে ক্রমে — নিত্য স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা পরমজ্যোতিঃরূপ পরমব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা — ইহাই অভ্যাসযোগ। এ পথে ক্রমে এক জন্মে বা বহু জন্মে ঐ বিকল্পবিহীন সমাধিলাভ হয় শ্রীভগবানের কৃপায়। আর এক উপায়েও ঐ অবস্থা লাভ হয় — উহা সর্বস্বত্যাগের পথ। শরীর মন আত্মা দ্বারা যাহা কিছু কার্য হয় তৎসমুদয়ই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া নিজেকে যথাসম্ভব যন্ত্রবৎ কল্পনা করিয়া 'যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইত্যুচ্যতে।' 'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ' (গীতা ৫-২)।

রাত্রি তিনটা। বেলুড় মঠের ধ্যানঘর, উহা দ্বিতলের মন্দিরের পশ্চিমাংশে। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া আছেন। মধ্যস্থলে বিরজা হোমের আয়োজন করা হইতেছে। পূজারী বসিয়াছেন পূর্বমুখী। সম্মুখে হোমপাত্রে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। উহার তিনদিক ঘেরিয়া উপবিষ্ঠ ব্রতীগণ। পূজারী পাঠ করিতেছেন এক একটি

বৈদিক আহুতিমন্ত্র, আর ব্রতীগণ উহাই উচ্চারণ করিয়া এক একটি ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন — ‘স্বাহা’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দুইটি উদ্দেশ্য। একটিতে সমগ্র বিশ্বকে অর্চনা করা নিজের স্বরূপ বলিয়া। অপরটিতে নিজের নিরাকার নির্গুণ অজর অমর অভয় পরমব্রহ্মের জ্যোতির্ময়রূপের ধ্যান।

যথাবিহিত রূপে হোম সমাপ্ত হইল। এইবার গুরুর নিকট হইতে, শিখাকর্তন, মহামন্ত্র, মহাবাক্য ও বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ বলিয়া নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন। সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। সাধুরা গঙ্গাস্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। পূর্বাকাশে প্রভাত-সূর্য উঠিতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ মহাবাক্য শুনাইয়া বলিলেন, এই যে সন্ন্যাস — এ কিছুই নয়। এটা বাইরের সন্ন্যাস। আসল সন্ন্যাস ভেতরে। ও না হলে এ কিছুই না — এ অতি তুচ্ছ। কিছুই নাই এতে।

ঠাকুর সকলের অন্তরাত্মা। তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা — এটা হল আসল সন্ন্যাস।

নবীন সন্ন্যাসীগণ তিনদিন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসীর রীতি গ্রহণ করিলেন। অগ্নি স্পর্শ করিলেন না। গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহার করিলেন। প্রথম দিন শ্রীমহাপুরুষ একজন সাধুর ভিক্ষার ঝুলি হইতে এক কণা মাধুকরী অন্ন গ্রহণ করিলেন। একদিন একজন সাধু পঙ্গদে সকলকে অল্প-অল্প মাধুকরী বিতরণ করিলেন। নূতন সন্ন্যাসীদের ভোজন-স্থান স্বামীজীর বিল্বতল, বাগান ও গঙ্গার ঘাট।

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মরূপতা-প্রাপ্তি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য অভ্যাসরূপ ব্রত গ্রহণ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীমাত্রেই দুইটি কার্য করেন — একটিতে স্বরূপের প্রাপ্তি বা সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি। অপরটিতে জগতের কল্যাণ। আজ হইতে সমগ্র বিশ্ব তাঁহার স্বজন, পরিবার।

শ্রীম সন্ন্যাসব্রতের এই দেবদুর্লভ বিবরণ শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। আর আবেগভরে মধুর কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — ভারতীয় সংস্কৃতিতে সন্ন্যাসী জগৎগুরু। তাই সর্বজন পূজ্য।

ঈশ্বরদর্শন মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই আদর্শটি সমাজের চক্ষুর সম্মুখে রেখে ভারতসভ্যতার নির্মাতা ঋষিগণ সকল সামাজিক নিয়ম প্রণয়ন করেন। এইটি তাঁদের আদি আবিষ্কার। এইজন্যই অত ওঠাপড়ার ভেতরও ভারতের উন্নতশির। সন্ন্যাসীগণ এই সনাতন আদর্শকে ধরে রেখেছেন। সন্ন্যাস ভারতের হৃদয়মণি।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মাঘ মাস। আজ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

এখন সকাল সাতটা। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সামনে একটি স্টুলে গড়গড়াটি রাখা হইয়াছে। একটি লম্বা কাঠের নল মুখে সংলগ্ন। আনমনে টানিতেছেন।

মঠের ভাণ্ডারী স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ আসিয়াছেন। তিনি আজ ভোগে কি কি যাইবে তাহা মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন। কলিকার আগুন হাওয়ায় উড়িতেছে দেখিয়া তিনি ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া দিলেন।

একটি সাধু মহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। লাল ভেলভেটের পাদুকা স্পর্শ করিয়া তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন, 'গুরু, প্রভু, বাবা, আমায় সদ্‌বুদ্ধি দাও।'

সাধু মাথা তুলিতেই মহাপুরুষ বলিতেছেন, ভাল আছ? সাধু উত্তর করিলেন — আজ্ঞে হাঁ, ভাল আছি।

মহাপুরুষ আবার বলিলেন — যাক্, সন্ন্যাস হয়ে গেল। অনেক দিনের বাসনা ছিল, এবার হয়ে গেল। শরীরটা ভাল থাক্। এখন তাঁর স্মরণ মননে ডুবে যাও। একেবারে সেই ব্রহ্মের চিন্তায় ডুবে যাও।

(একটু হাসিয়া) ঠাকুরই ব্রহ্ম, স্বামীজী ব্রহ্ম। স্বামীজী ঠাকুরের ডান হাত। ঋষিকল্প পুরুষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এমন ভক্তিপূর্ণ পুরুষ বিরল, এই যাঁর সেবা তুমি করছো।

একটি সাধু স্বগত ভাবিতেছেন। কি সৌভাগ্য আমাদের! সাক্ষাৎ ধর্ম কথা কহিতেছেন। জীবন্ত ধর্মমূর্তি শ্রীগুরু সম্মুখে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। অশীতি-বর্ষ বয়স প্রায়। আবার পবিত্র সুরধুনী (গঙ্গা) তীর। যাঁরা অতি সৌভাগ্যবান তাঁরাই এঁদের একটু চিনতে পারেন।

তাঁরা দেখতে পান, বৈদিক উপনিষদ্ যুগের ছবি আমাদের সম্মুখে প্রকটিত — ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি সম্মুখে বসে আছেন।

এখন সকাল আটটা। দোতলার বারান্দায় একটু সূর্যকিরণ আসিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ গরম র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে, সবুজ রং-এর কুশানের উপর ছোটঘরের উত্তরদিকে পূর্ব-দক্ষিণাস্য। পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সেবক উমেশ ও শৈলেশ।

স্বামীজীর ঘরের সেবক নিচে হইতে ডাবর ধুইয়া আনিয়াছেন। প্যাসেজে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, শ্রীমহাপুরুষ কথা কহিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — আমি তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, আমার আবার যমের ভয় কি? — এই ভাব থাকলে ভয় কি?

শৈলেশ — আশীর্বাদ করুন, যেন এই ভাব আসে।

মহাপুরুষ — আসছে, আসবে, এসেছে — ক্রমে আসছে।

শৈলেশ — আচ্ছা, ঠাকুরের যে ভাব, তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পর তা আপনাদের ভিতর দিয়ে কাজ করছে আবার আপনাদের যে ভাব তা আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করবে কি?

মহাপুরুষ — কাজ করছেই দেখতে পাচ্ছি। হাঁ, স্থূল চলে গেলেও তিনি সূক্ষ্মে সেই সব কাজ করছেন। অবতার আসার বিশেষত্বই তো এই!

শৈলেশ — জপ ধ্যানের সময় ভাবি — ঠাকুরের যেসব ভক্ত, যেমন মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শরীর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরা তো আর স্থূল শরীরে জপ ধ্যান পূজা করতে পারেন না। তাই আমাদের ভেতর দিয়ে এঁরা এইসব করাচ্ছেন।

মহাপুরুষ — এ-ও ভাল, এ-ও একরকম ভাব।

শৈলেশ — যদি wrong (ভুল) হয় করবো না।

মহাপুরুষ — না, তাঁরা সহায় হোন্। যে সব ভক্তরা শরীর ছেড়ে চলে গেছেন, স্পিরিটে সূক্ষ্মে আছেন, তাঁরা সহায়তা করুন।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এবার শ্রীম কথাবার্তা করিতেছেন।

শ্রীম — হাঁ, ঠিকই তো! তাঁরই স্পিরিট এখনও ঐভাবে কাজ করছে ঠাকুরের সর্বত্যাগী ও গৃহী ভক্ত ছেলেদের ভেতর দিয়ে। কেন না, ঠাকুর নিজেই বলেছেন — ‘মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার

ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, সুখ শান্তি, ভাব মহাভাব, প্রেমসমাধি।' আরও বলেছিলেন, 'আমি কে, আর তোরা কে এটা জানতে পারলেই হবে।' বলেছিলেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে, তোদের আর কিছু করতে হবে না।'

এই যে তোমরাও ঠাকুরকে ধরেছ, তাঁর ধ্যান নাম গুণকীর্তন ও চিন্তন নিয়ে আছ, তাঁর কাজ করছ, সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর শরণাগত হয়েছো — ঠাকুরের স্পিরিটই তো তোমাদের ভেতর দিয়ে কাজ করছে!

শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — আহা, কি বিবরণ চোখের সামনে, যেন মঠকে ধরে এনেছেন। আমরা বুড়ো হয়েছি, সর্বদা মঠে যেতে পারি না। তাই ঠাকুর কৃপা করে আপনাদের পাঠিয়ে দেন। মঠ সর্বত্যাগীর স্থান। মঠের কথা শোনা মানে সর্বস্ব ত্যাগের সংবাদ শোনা। এই ত্যাগের চিত্রটি সম্মুখে রেখে চলা। তবেই মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, বা আত্মদর্শন হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে। ত্যাগের সংবাদ থাকায় সংসার দেবভূমি।

শ্রীমকে প্রণাম করিয়া আনন্দ উঠিলেন। স্বামী দেশিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি ডেন্টিস্টের নিকট যাইবেন। এখন সকাল সাড়ে দশটা।

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ন পৌনে ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য দোরগোড়ায় বসা। স্বামী শ্রীবাসানন্দ শ্রীম-র বাঁ হাতে বেঞ্চিতে। ইনি অনেকক্ষণ পূর্বে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম-র ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে শুকলাল, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের আদর করিয়া পাশে বসাইলেন। তাঁহারা সকালেও আসিয়াছিলেন। ধর্মতলায় একজন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়াছিলেন। এখনও সেখান হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম-র লিখিত 'গস্‌পেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ' (Gospel of Sri Ramakrishna) -এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা বাহির হইয়াছে

'মডার্ণ রিভিউ'-তে। মহেশ ঘোষ সমালোচক। শ্রীম ভালমন্দ-মিশ্রিত সমালোচনার ভাল অংশগুলি পড়িয়া সাধুদের শুনাইতেছেন। এক এক জায়গায় বলিতেছেন 'এই শুনুন — এই একটা assertion, স্বীকার-উক্তি। ঠাকুরকে মানছেন তা হলে অবতার বলে!' মন্দগুলি পড়িলেন না। বলিলেন, 'ঐগুলি with a pinch of salt (একটু ভেবে চিন্তে) নেওয়া উচিত।'

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ বলিলেন, অতগুলি বই ঠাকুরের সম্বন্ধে পড়ে লিখেছেন — তাই লাভ। শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তাই বই কি, তাই লাভ। গোড়ায় রোমাঁ রোলাঁর বই।

স্বামী শ্রীবাসানন্দ ও দেশিকানন্দ চলিয়া গেলেন মঠে।

শ্রীম, বিনয়, অমূল্য, জগবন্ধু, পূর্ণেন্দু ও বলাইকে লইয়া গেলেন ট্যাক্সিতে বায়স্কোপে The Pearl-এ (পার্ল), কুম্ভমেলার ছবি দেখিতে। ডাক্তার বক্সীও আসিয়াছেন। ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ীতে বিনয় ও জগবন্ধু মঠে গেলেন বাগবাজার হইতে শেষ স্টীমারে!

বেলুড় মঠ।
১৪ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বালক তো ষোল আনা বালক

১

মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। চারতলার ছাদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। এখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা। দুইজন সন্ন্যাসী — স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে ধর্মতলায় দাঁতের ডাক্তারের নিকট গিয়াছিলেন, সেখান হইতে শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন দেখা করিতে।

একটু পরেই শ্রীম ছাদে আসিলেন। এতক্ষণ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিলেন। সাধুরা শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। তিনি পূর্ণেন্দুকে বলিলেন, সতরঞ্জি পেতে দিন। সাধুরা তাহার উপর বসিলেন। শ্রীম উপবিষ্ট মধ্যছাদে চেয়ারে, উত্তরাস্য। সাধুরা বসিয়া আছেন শ্রীম-র সামনে বাম হাতে। কথাবার্তা হইতেছে কুশলপ্রশ্নাদির পর।

শ্রীম (জনৈক সাধুর প্রতি) — আর শ্রীমহাপুরুষের কথা আছে শোনাবার? তাঁদের কথা ঠাকুরেরই কথা। প্রাণ শীতল হয় এতে। শোনান, শোনান ঠাকুরের জীবন্ত বাণী।

সাধু দৈনন্দিনী খুলিয়া পাঠ করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল, সাড়ে সাতটা। আজ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। মহাপুরুষ গেরুয়া রংয়ের একটা গরম র‍্যাপার জড়াইয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন উত্তর প্রান্তে, পশ্চিমাস্য। ঘরে কয়েকজন দক্ষিণদেশীয় সাধু রহিয়াছেন — ভজহরি মহারাজ, রামনাথ মহারাজ, ব্রহ্মচারী নারায়ণ চৈতন্য (নাঞ্জাপ্পা), কেশব প্রভৃতি। ইঁহারা প্রণাম করিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী নির্বাণানন্দ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন খাটের দক্ষিণ পাশে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণামান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণ দরজার পশ্চিম পাশে, উত্তরাস্য।

একটি বাহিরের সাধু আসিয়া শ্রীমহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গেরুয়া পরা, তাঁহার লম্বা কতক পক্ক কেশ ও শ্মশ্রু। বয়স পঞ্চাশের উপর। বরাহনগরে বাড়ি। বাড়িতে কালীমাতা প্রতিষ্ঠিতা। এই সাধুর পিতা 'ঠাকুর দাদা' ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, মনের অশান্তির কথা বলায় — 'ও বুঝেছি। দাঁতে দাঁতে পড়ছে না। এখানে এসো এক একবার। টিপে লাগিয়ে দিব!'

সাধু প্রণাম করিয়া করজোড়ে মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিতেছেন — 'মহারাজ, আমায় সন্ন্যাস দিন।'

মহাপুরুষ — না, বাবা আমরা অমন সন্ন্যাস দি'না।

সাধু (বারংবার সকাতর মিনতির সহিত) — আচ্ছা, সন্ন্যাস না দিন পর্ণাভিষেক দিন।

মহাপুরুষ — না, তা হবে না। ওসব কিছুই হবে না। তোমার তো হয়ে গেছে। এতদিন যাবৎ যা করছো তাই কর।

সাধু (অধিকতর পীড়াপীড়ির সহিত) — দীক্ষা, বা ব্রহ্মচর্য দিন।

মহাপুরুষ — যা করছো তাই কর। তবে তাঁর নাম ক'রে কর। তিনিই নানাভাবে রয়েছেন। তোমার মা (কালী) যিনি, তিনিই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। তিনি যুগাবতার। যা করছো তাই তাঁকে আশ্রয় করে করো। আর কি বলব। যা বলছি তাই কর।

সাধু (আরও, অধিকতর পীড়াপীড়ির সহিত) — না মহারাজ, আমায় কৃপা করুন।

মহাপুরুষ — তুমি বুড়ো হয়েছো, চুল পাকিয়েছো। আর এসব কি বলছো? এতদিন সাধুগিরি করে এসে এখন ওসব কথা কি জন্যে? বলছি তো, যা করছো তাই করো!

সাধু (অতিশয় আর্তির সহিত) — আমার কিছুই হয় নাই। আমি সব ভুলে গেছি। আপনি সেই মন্ত্র আবার দিন। আমার কোন কিছুই হয় নাই, কিছুই বুঝি নাই।

মহাপুরুষ — তাই যা বলছি তাই করো। এখানে কিছুই হবে না।

এই সময় মহাপুরুষ মহারাজের সেক্রেটারী স্বামী গঙ্গেশানন্দ প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষ (স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রতি, বালকের ন্যায় নিরুপায় হইয়া) — কি বলছে শোন — এতদিন সাধুগিরি করে...। (সাধুর প্রতি) দীক্ষা দু'বার হয় না। যা পেয়েছ তাই ঠাকুরকে আশ্রয় করে কর।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ (বড় পাঁউরুটি ও ছুরি হাতে) — ওঁর ইচ্ছা এখানে থাকা।

মহাপুরুষ — না, এখানে থাকা হবে না — এখানে হবে না। যা বলছি কর। ওখানে থাক। আর সাধন ভজন করো। আর বরানগর orphanage-এ (অনাথাশ্রমে) একটু কাজ করো। একটু কাজ থাকা ভাল। ছেলেকে রেখেছ, নিজেও একটু কাজ করো।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ (সাধুর প্রতি) — আপনি ওঁকে বকাবেন না। এতে ওঁর মাথা গরম হয়। চলে আসুন। আমরা আপনাকে বলবো। যদি এমন করেন, তা হলে ওপরে উঠতে দেব না।

সাধুর প্রস্থান।

অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। শীতকাল, গায়ে গরম কোট পরিয়া শ্রীমহাপুরুষ আপন কক্ষে বসিয়া আছেন দরজার পাশে ইজি-চেয়ারে, পশ্চিমাস্য। একখানা প্রবুদ্ধ ভারতের পাতা উল্টাইতেছেন। আজ শনিবার বলিয়া আফিসের ফেরৎ ভক্তরা কেহ কেহ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ভোলানাথ মুখার্জী (ভবরানী) প্রভৃতি দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন প্রণাম করিয়া। একজন কিছুদিন পূর্বে মঠে সাধু হইয়াছিলেন। যুবক চৈতন্যভক্ত। এখন 'লিবার্টি'-তে কাজ করেন। মহাপুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন অতি প্রসন্নভাবে। কথায় কোনও গোঁড়ামি নাই — যে যে-ভাবে ভগবানকে ডাকে তাই উত্তম — সম্পূর্ণ নির্দোষ দৃষ্টি। উদার সহানুভূতিতে কথাগুলি পরিপূর্ণ।

মহাপুরুষ (যুবকের প্রতি) — তোমার ভেতর ভক্তিভাব রয়েছে। তোমাদের বংশের রক্তে ঐ ভাব রয়েছে। বাইরে কোন চিহ্ন না থাকুক, মালাতিলক ইত্যাদি। কিন্তু, ভক্তি রয়েছে রক্তে। চৈতন্যদেব কৃপা করবেন। চৈতন্যদেবই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। বৈষ্ণবরা জপ করেন 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' — এই মন্ত্র।

যুবক — ওঁদের মন্ত্র আরো ছোট।

মহাপুরুষ — না, ঐটাকেই ছোট করে বলেন।

সন্ধ্যার পর, এখন প্রায় সাতটা। মহাপুরুষ গঙ্গার দিকের বারান্দায় চেয়ারে পূর্বাস্য, ছোট ঘরের পাশে। সম্মুখেই নিচে গঙ্গা। ওপারের স্টীমার ঘাটের বিজলীর মালা দেখা যাইতেছে। ঐ আলো জলে পড়ায় জল চক্‌চক্ করিতেছে।

শীতকাল, পায়ে মোজা। মাথায় কানঢাকা টুপি। গায়ে গরম কোটের উপর র‍্যাপার জড়ান। পায়ের উপর একখানা গরম শাল দুই ভাঁজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে — শীত না লাগে আর মশা না কামড়ায়। সেবক মতি পাশে দাঁড়াইয়া।

মহাপুরুষের পায়ের নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত মহিলা বসিয়া আছেন। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। আরতি দর্শন করিয়া তাঁহারা বাড়ি ফিরিবেন এইবার। অল্প কথাবার্তা চলিতেছে।

মহাপুরুষ (একজন মহিলার প্রতি) — গীতা পড়ছো?

ভক্ত মহিলা — আজ্ঞে হাঁ, বেশ লাগে।

মহাপুরুষ — বালকের ন্যায় — এই সবই ঠাকুরের কথা।

ভক্ত মহিলা — মহারাজ, ধ্যানজপের সময় সংসারের নানা কথা ওঠে মনে — কি করবো!

মহাপুরুষ (সস্নেহে করুণামাখা স্বরে বালকের ন্যায়) — ওসব আসবেই মা। তবে স্থান দেবে না। বিচার করবে — মনকে বলবে, মন এখন বিরক্ত করো না। এখন তাঁকে ডাকছি, তুমি বিরক্ত করো না। আর প্রার্থনা করবে — হে প্রভো, জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন দিয়ে তোমাকে পাবার শক্তি আমার নাই। তুমি দয়া করে আমায় দেখা দাও, শান্তি দাও। আর বালকের মত কাঁদবে। কাঁদলেই শান্তি।

(একটু নীরব থাকিয়া) বালকের মত কাঁদা সহজ নয়। কাঁদলে কিন্তু শান্তি।

(স্বগত) গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।' (গীতা ৯-১৮)

'আমিই গতি, আমিই ভর্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃদ, আমিই প্রভব (স্রষ্টা), আমিই

প্রলয় (সংহর্তা), আমিই স্থান, আমিই নিধান (লয়স্থান)। আর আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ।’

আবার আছে, তুমি সাকার, তুমি নিরাকার, তুমিই আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।

এইসব প্রার্থনা ক’রে, ব’লে — তুমি ধ্যানজপ করতে বসো।

একজন সাধু স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য দর্শন করিতেছেন, এই জীবন্ত মর্মবাণী শুনিতেছেন।

মহিলা ভক্তগণের প্রস্থান। একজন পুরুষ ভক্তের প্রবেশ।

এখন রাত্রি সওয়া সাতটা প্রায়। স্টীমার সাড়ে সাতটায়। তাই সেবক মতি বলিলেন, ঐ স্টীমার আসছে। প্রণাম করে ঘাটে গিয়ে বসুন।

মহাপুরুষও বলিলেন — হাঁ, স্টীমারঘাটে গিয়ে বসা ভাল।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের প্রবেশ। মহাপুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন — কি, প্রিয়নাথ কি? উনি উত্তর করিলেন কিছুই না। এমনি এসেছি।

ইনি মহাপুরুষের সামনে দাঁড়াইলেন একটু বাঁ হাতে। পিছনে রেলিং, তাহার পিছনে গঙ্গা।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ — মঠে কি সরস্বতী পূজো হবে?

মহাপুরুষ — কোথায় হবে?

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ — ঠাকুরঘরের পূর্বের বারান্দায়ও অনেক দিন হয়েছে।

মহাপুরুষ — ধ্যানঘরেও হয়েছে। নতুন বাড়িতেও হয়েছে। অনেকখানেই হয়েছে। একটি ছোট প্রতিমা আনা। ভোগ, খিচুড়ী আর পায়েস। পায়েস তো ঘরে আছেই।

মতি — অনেক ভাজা করতে হয়।

মহাপুরুষ — হাঁ, কি আছে করতে হয়। আমি বাবা সাকার পূজো বিশ্বাস করি না — না, আমি সাকার বিশ্বাস করি না। তবে যারা করতে চায় তাদের বাধাও দি’ না — করুক।

শ্রীম — আমার প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি সাকার নিরাকার — আরো কত কি। পড়ুন পড়ুন।

তাঁর রূপের ইতি নাই। বলতে গেলে নিরাকারও একটা রূপ। এই স্বরূপের ঝগড়া মেটাতেই ঠাকুরের অবতরণ। মতবাদের গোঁড়ামী ভাঙ্গাই ঠাকুরের অন্যতম প্রধান কাজ। বললেন, মত পথ।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। দোতলা। এখন সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। কয়দিন একটু গরম ভাব ছিল। আজ বেশ শীত পড়িয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

শ্রীমহাপুরুষ নিত্য গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়া গঙ্গাদর্শন করেন। আজ শীত পড়ায় আর যান নাই। ঠাণ্ডা হাওয়াও বহিতেছে। সব দরজা জানালা বন্ধ — প্যাসেজের, স্বামীজীর ঘরের, খোকা মহারাজের ঘরের, আফিস ঘরের, মহারাজের ঘরের ও মহাপুরুষের ঘরের।

মহাপুরুষের গায়ে বৃন্দাবনী খয়েরী রং-এর পিরান। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে ভেলভেটের চটি। একটু সামনে ঝুঁকিয়া বেড়াইতেছেন — নিজের ঘরের দরজা হইতে প্যাসেজের দরজা পর্যন্ত একাকী, যেন আনন্দময় বালক। মুখমণ্ডলে মৃদু হাসির ঝলক। কিছুই চিন্তা ভাবনা নাই — সংসারের, এমন কি নিজের শরীরের কথাও যেন মনে নাই, এমনি নির্মুক্ত নিশ্চিন্ত আনন্দময় ভাব — ইহাই বুঝি পরমহংস অবস্থা!

শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণাস্য। একটি সাধু গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেদিন বলেছিলেন স্বামীজীর ঘরের সারসি খোলা রাখতে। আজ শীত পড়েছে, বন্ধ করবো কি? শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — হাঁ, যেমনটি নিজের ভাল লাগবে তেমনটি করবে। এতো শীত পড়েছে আজ। আত্মভাবে সেবা।

সাধু স্বামীজীর ঘরের সেবক। তিনি স্বামীজীর ঘরে চলিয়া আসিলেন। মহাপুরুষও পিছনে পিছনে আসিতেছেন। সাধু স্বামীজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইলেন, ঘরের ভিতর। মহাপুরুষ দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ধূপ দিয়েছো? সাধু বলিলেন — আজ্ঞে না, এইবার দেব। মহাপুরুষ বলিলেন, দাও, এই তো সময়। এখনই দিতে হয়।

সাধু ধূপ জ্বালাইয়া সমস্ত ঘরে দেখাইতেছেন। তারপর টেবিলে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ দরজার রেলিং ঠেলিয়া ঘরের ভিতর দেখিতেছেন — যেন স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন। ছলছল উন্নত চক্ষু, মুখমণ্ডলে এক দৈবী জ্যোতি প্রস্ফুটিত, হৃদয় মন প্রেমানন্দে ঢলঢল — এক অপার্থিব বালক পরমহংস।

শ্রীম — বালক তো ষোলআনা বালক। এটি একটি অবিস্মরণীয় চিত্র — পরমহংস অবস্থা।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সওয়া সাতটা। মহাপুরুষ খাটে নিত্যকার মত বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলের সঙ্গে কথা ক'ন — সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাল আছ? শব্দ দুইটি, কিন্তু তাহাতেই সাধুদের মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া যায়।

এই সময় একেবারে আচার্য ভাব। সাধুরা সর্বস্ব ছাড়িয়া ঠাকুরের আশ্রয়ে আসিয়াছেন। তাঁহাদের দেখাশোনার ভার যেন ঠাকুর দিয়াছেন মহাপুরুষের উপর।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মনে মনে ঠাকুরকে ও তাঁহার নিজের ছবি চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর আমায় সদ্‌বুদ্ধি দাও। সাধু মাথা তুলিতেই দেখিলেন, মহাপুরুষ ধ্যানমুদ্রায় বলিতেছেন, "নমঃ শিবায়"।

সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ? আজ্ঞে, ভাল আছি — সাধু উত্তর করিলেন। সাধু আরও নিবেদন করিলেন, স্বামী যতীশ্বরানন্দ মাদ্রাজ থেকে আমার পত্রে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। মহাপুরুষ বলিলেন — হাঁ আমাকেও লিখেছে। সে এখন কয়ম্বতুর, ত্রিচুর গেছে।

স্বামী সারদেশ্বরানন্দের প্রবেশ। ডাক নাম নলিনী। গত রাত্রিতে ফিরিয়াছেন। এলাহবাদ কুম্ভদর্শনান্তে কাশী নালন্দা রাজগীর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। ইনি প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ মহারাজ বালকের ন্যায় আনন্দে বলিতেছেন, — "নলিনীদলগত জলমতিতরলং, তদবৎ জীবনং অতিশয়ং চপলম্, ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং

মূঢ়মতে।”

একটি সাধু স্বগত ভাবিতেছেন, আমাদের সকলকে রহস্যচ্ছলে বুঝি বলিতেছেন — ‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।’

নালন্দা রাজগীরের কথায় বলিতেছেন, কি আর দূর? এই তো এইখানে পাটনা। গেলেই হয়। ওরাই সেখান থেকে যোগাড় করে পাঠিয়ে দেবে। তিনচার টাকা লাগে। চার পাঁচদিনে হয় — তা-ও লাগে না।

একুট সাধু ভাবিতেছেন, এইসব ভাইদের কি সুন্দর বাসনা। আমার এসব আর এখন হয় না। পূর্বে হ’তো পড়ার সময়। সাধু হয়ে আর হয় না। এখন মনে হয়, কি হবে বাসনায় ঘুরে ঘুরে ফিরে? শরীর ভগ্ন। এই তো জীবন — আজ আছে কাল নাই! এখনও তো ভগবানদর্শন হলো না। জন্ম নেওয়া কি দুঃখ, শুনেছি শাস্ত্রে। অবতারও জন্ম নেন — কিন্তু, তিনি তো জ্ঞানস্বরূপ। তাই ঘুরতে ইচ্ছা হয় না। আর আমার স্বভাব ঘুরে ঘুরে না বেড়ান। তবে আজকাল মনে এইসব হয় — একটি সুন্দর স্থানে একটি আশ্রম হবে। সাধুরা সব সাধনভজনশীল, পরস্পর সহানুভূতি ও প্রেমসম্পন্ন। আহারের মোটামুটি ব্যবস্থা থাকবে। আর কর্মের ঝঞ্ঝাট কম।

স্বামী অক্ষয়ানন্দের প্রবেশ। মহাপুরুষকে প্রণাম করিতেই বলিতেছেন, কেশব মাধব দীনদয়াল। ভিতরে তীব্র উদ্দীপন হওয়ায় কোমর টান করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ এখন যেন যুবক, কি তেজোময় ভাব! আনন্দে হাততালি দিয়া গাহিতেছেন, হা ব্রজনাথ, হা দীনদয়াল।

একটি সাধু ঘর হইতে বাহির হইয়া স্বামীজীর ঘরে যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, সব জিনিসেই কি আনন্দ, কি শুদ্ধ পবিত্র ভাব। পূর্বের ন্যায় গভীর ধ্যান না হলেও কথায়, কীর্তনে যেন আনন্দ বর্ষণ হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থা লাভ হবে?

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট সম্মুখে গঙ্গা। পাশে সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও মতি, প্যাসেজের দরজা ভেজান। স্বামীজীর ঘরে আলো ও ধূপ দেখাইতেছেন একজন সাধু।

টাঙ্গাইলের একজন ভক্ত আসিয়াছেন। বয়স ত্রিশ। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া এ-কথা সে-কথার পর বলিতেছেন — মহারাজ, এই গত ঠাকুরের উৎসবে আমার ভাই স্বপ্নে আপনার কাছে দীক্ষা পেয়েছে। সে সেভেন্থ

ক্লাসে পড়ে।

মহাপুরুষ বলিলেন, আমি বাবা কিছু জানি না। ঠাকুরই দিয়েছেন। তবে যে মন্ত্রটি পেয়েছে ঐ সঙ্গে ঠাকুরের নামটিও চাই —‘রামকৃষ্ণ’ নাম।

প্যাসেজে দাঁড়াইয়া একজন শুনিলেন এই মহাবাক্য — ‘রামকৃষ্ণ’ নাম চাই।

শ্রীম — তাই তো সত্য — রামকৃষ্ণ বই কি কিছু আছে? মা-ই সব হ’য়ে রয়েছেন। ঠাকুর দেখিয়েছিলেন এইটে — মা-ই ঘরবাড়ি সব। রামকৃষ্ণ তা-ও মা-ই।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। সেবক সাধু স্বামীজীর ঘর খুলিতেছেন। আলো দিবেন। শ্রীমহাপুরুষ পাশের প্যাসেজ দিয়া গঙ্গার বারান্দায় যাইতেছেন টলিতে টলিতে। একখানা মুগার বস্ত্র পরিধানে, গায়ে গরম কোট। শরীর অসুস্থ, তাহাতে বার্ধক্য। মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন। মুখের জ্যোতির্ময় ভাব দেখিলে মনে হয় না শরীরে ব্যাধি।

সেবক সাধু ভাবিতেছেন, কি অদ্ভুত কল করিয়াছেন ভগবান। এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন — তাঁহার অন্তরাত্মা ব্রহ্ম — এই জ্ঞান থাকাসত্ত্বেও শরীরের দুঃখকষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভ নাই। বিচিত্র সৃষ্টি!

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। রাম কেঁদেছেন, কৃষ্ণ কেঁদেছেন, ক্রাইস্ট কেঁদেছেন। সব কাঁদছেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সামনে একটি স্টুলে গড়গড়া হুঁকা। একটি লম্বা কাঠের নল মুখসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এক একবার টানিতেছেন। আবার অন্তর্মুখ, কি ভাবেন। আবার প্রণামরত সাধুদের সঙ্গে কথাও ক’ন। কখন ফষ্টিনষ্টি — কখনও গম্ভীর ভাব।

এখন সকাল সাতটা। স্বামী শ্রীবাসানন্দ মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

আছেন। পূর্বাশ্রমে থাকার সময় ইনি বাঙ্গালোর মঠ স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দক্ষিণ ভারতের কথা দুই একটা হইতেছে। ব্রহ্মচারী কেশব ও প্রতুল দাঁড়াইয়া আছেন।

একজন সাধু ঘরের ভিতরে দক্ষিণ দিকের টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন — পিছনে পশ্চিমের জানালা। তিনি একদৃষ্টিতে মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন — এক 'আশ্চর্য বক্তা'কে।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ গৃহে প্রবেশ করিতেই আনন্দে বলিতেছেন, 'নমঃ গঙ্গেশানন্দায় নমঃ', (হাস্য)।

নিচে চায়ের ঘন্টা পড়িয়াছে। সাধুরা একে একে যাইতেছেন। প্রতুল চলিয়াছে। মহাপুরুষ বলিলেন, চা খাও প্রতুল? না মহারাজ, প্রতুল উত্তর করিল।

আর একজন সাধুও ঘরের বাহির হইতেছেন। তাঁহাকেও মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, চা খাও আনন্দ? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। মহাপুরুষ হাতে বারণ করিয়া বলিলেন, 'না' — অর্থাৎ চা না খাওয়াই ভাল।

অপরাহ্নে মাদ্রাজের বিখ্যাত টি.বি. চিকিৎসক ডাক্তার কেশব পাই আসিয়াছেন। সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের এক পার্টি। মহাপুরুষের ঘরে তাঁহারা বসিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া। নানা কথা হইতেছে ওদেশের।

ডাক্তার পাই শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, He has given me this knowledge that this body is nothing (ভগবান ঠাকুর আমাকে কৃপা করে এই জ্ঞান দিয়েছেন — এই শরীর কিছু নয়, নাশবান বস্তু)। কিন্তু আত্মা অবিনাশী। আমি সেই আত্মা — শরীর নয়।

সকাল সাড়ে সাতটা। একটি সাধু সিঁড়ি ঝাঁট দিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ কি পাঠ করিতেছেন। কিন্তু, বুঝা যাইতেছে না। কৌতূহলী হইয়া তিনি দরজার কাছে উঁকি মারিলেন। পরদা ফেলা। কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শুনিলেন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন।

'কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়করি ভূবি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥

সাধুর তৃপ্তি হইল না। পাঠরত মহাপুরুষকে দর্শন করা চাই। তাই ছাদে ঝাঁটা রাখিয়া উত্তরের দরজার সারসির ফাঁক দিয়া দর্শন করিলেন। মহাপুরুষ খাটে বসা, ছোট চণ্ডীর পাতা উল্টাইতেছেন। ঘরে হীরেন মহারাজ দাঁড়ান।

তাহাতেও মনে তৃপ্তি আসিল না। ভাল করিয়া দর্শন করিতে হইবে। সাধুর হাতে স্বামীজীর ঘরের ডাবর। গঙ্গায় ধুইতে হইবে। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁতশালার শচীন ঘরে ঢুকিতেছে। আর স্বামী সারদেশ্বরানন্দ বাহিরে আসিতেছেন। তখন দেখিলেন, মহাপুরুষ খাটে উপবিষ্ট।

গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাবর রাখিয়া আবার আসিলেন সাধু। দেখিলেন, এবার দরজা একেবারে খোলা। অনেক সাধু ঘরে। সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও মতি, আর স্বামী ভাস্বরানন্দ প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইয়া আছেন।

মহাপুরুষ খাটে বসা। হাতে ছোট চণ্ডী, পাতা উল্টাইয়া পড়িতেছেন। সামনে খাবার টেবিল। হুঁকা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সাধু দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্র পড়িতেছেন। প্রতিটি শব্দ যেন জীবন্ত, তেজোময়।

শ্রীম — অবতারের জীবন্ত তেজোময় শক্তি কিভাবে তাঁর পার্ষদদের ভেতর থেকে আসছে। ভক্ত ভাগবত ভগবান এক — ঠাকুর বলতেন।

৩

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল, মাঘ মাস। আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। ২৭শে মাঘ, ১৩৩৬। শুক্ল পক্ষ।

মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, পশ্চিমাস্য। সামনে ছোট স্টুলে গড়গড়া। কাঠের লম্বা নলটা মুখে সংলগ্ন। এক একবার দুই-একটা টান দিতেছেন। মন অন্তর্মুখ, দৃষ্টি ভিতরে।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাপুরুষ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতেছেন — কি হলো, কি হলো? ম্যানেজার

উত্তর করিলেন, ঐ জায়গা নিয়ে গোলমাল আছে মুসলমানদের সঙ্গে।

মঠ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের জন্য জমি খরিদ করিয়াছেন একজন মুসলমান প্রজার নিকট হইতে। পাশে একটা ছোট গ্রাম্য মসজিদ। কেহ কেহ ঐ জমি মসজিদের জন্য নিতে চায়।

শ্রীমহাপুরুষ উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, সে কি, আমরা কিনেছি। আমরা কেন ছেড়ে দেব?

ম্যানেজার বলিলেন, হয়তো এ নিয়ে শেষে কোর্টে যেতে হবে।

মহাপুরুষের চক্ষু দুইটি বড় হইয়া উঠিল। অধিকতর উত্তেজনার সহিত বলিতেছেন, আমরা টাকা দিয়েছি, ইস্কুল হয়েছে। আর এখন কে এসে বলছে, উঠে যাও। যাক্ না, যে বেচেছে আমাদের কাছে, তার কাছে এইভাবে।

আজ অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছে। জোরে হাওয়া বহিতেছে। এখন পাঁচটা। মঠের উপরের সকল ঘরের বাহিরের জানালা-দরজা সব বন্ধ। মঠের সেবক রজনীবাবু বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। রজনীবাবু সিঁড়ির রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দুইটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে কিছুক্ষণ হইতে। মহাপুরুষের দৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পড়িতেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা কি চাও? হাঁ তোমাদের হবে, যাও হবে।

দক্ষিণের দিকে আসিতেছেন, প্যাসেজের মুখে আসিয়া পুনরায় ভক্তদের দিকে ফিরিয়া সেবককে বলিলেন, প্রসাদ দিয়ে দাও। এসো রজনী এইদিকে, বলিয়াই প্যাসেজের ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকের বারান্দায় যাইতেছেন। নিভৃতে কথা কহিবেন।

চৌকাঠ পার হইয়া দক্ষিণাস্য দাঁড়াইলেন, রজনীবাবু উত্তরাস্য। তাঁহার পিছনে স্বামীজীর ঘর। বালকের ন্যায় কৌতূহলী হইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হাঁ, বল দিকিন কি হল? রজনী উত্তর করিলেন, গোলমাল হবে না, অনেকটা আশাপ্রদ। এখানে বড় হাওয়া মহারাজ, ভিতরে চলুন। মহাপুরুষও শিশুর মত বলিলেন, হাঁ, বড় হাওয়া, এসো এই (ছোট) ঘরে যাই। যেন ছোট শিশু — প্রিয়জনের সঙ্গে চলিলেন খেলনা বা মোদকের আশায়।

খোকা মহারাজের ছোট ঘরে মহাপুরুষ খাটে বসিয়াছেন। রজনীবাবু সামনে দাঁড়ানো উত্তরাস্য। ঘরের বিজলী জ্বালাইয়া দিলেন রজনীবাবু। একজন সাধু প্রথমে স্বামীজীর ঘরের পাপোশের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন — পরে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া শুনিলেন।

রজনীবাবু বলিলেন, মিটমাটের কথা উঠেছে।

মহাপুরুষ বলিলেন, আমি ঠাকুরকে প্রার্থনা করেছি — 'ঠাকুর তুমিই তো মুসলমান ধর্মের সাধনা করলে। আবার খ্রীস্টানদের — কত কি করলে। এখন তবে এখানে এরূপ গোল কেন?'

রজনীবাবু উত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ, আমিও করেছি। রজনীবাবু আবার বলিতেছেন, মুসলমান গুণ্ডাটার মন ফিরে গেছে। আজ এসে আমায় বলছে, 'এই দেখুন পরোয়ানা।' কোন মোল্লায় দিয়েছে আপস করার জন্য। বলেছে, 'আমিও খোদার কাজ করতে এসেছি।'

মহাপুরুষ আহ্লাদে বলিলেন, আরে এ-ও খোদার কাজ — এ-ও তাই। আমরা খোদার কাজ করছি! (একটু চুপ) দেখলে, এই তাঁর কাজ। এই ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর ওদের মন বদলিয়ে দিয়েছেন।

একটি সাধু অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, কি বিচিত্র আচরণ পরমহংসদেবের, নিচের মনটা দিয়ে বিষয়ের সহিত খেলা করছেন যেন কত বিষয়ী। উপরের মনটা শ্রীভগবানে লগ্ন। এঁদের জলের স্বভাব। যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ধারণ করে। অথবা যেন স্বচ্ছ কাঁচ। যার কাছে থাকে তার রং ধরে। নিজে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

তিনটি দৃশ্য দেখলাম — বিষয়ে সিংহতুল্য বিষয়ীর ন্যায়। রজনীর সামনে, শিশুর মত ঘরে এসে বসলেন। আবার ভক্তসঙ্গে করুণাময় — বললেন, এদের প্রসাদ দিয়ে দাও। হাঁ তোমাদের হবে (দীক্ষা), ভক্তদের বললেন। সাধু গীতার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আবৃত্তি করিতেছেন।

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥' (গীতা ৩-২২)।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। মহাপুরুষের ঘর। উনি খাটে বসা। আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী

১৯৩০, মঙ্গলবার। মঠের ভাণ্ডারী বিকাশ প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ বলিলেন, গঙ্গায় ছোট ছোট ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। রজনীবাবুকে বলে রাখবে। দু'চারটে এনে রোজ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে।

ঠাকুর সর্বদা মঠে রয়েছেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহে। এটা নিত্য প্রত্যক্ষ হয়তো করেন। নিজে অসুস্থ, মাছ খান না। কিন্তু ঠাকুরের আহারের উপর কত দৃষ্টি! মহাপুরুষের দৃষ্টি সর্বত্র।

শ্রীম — ভক্তের কাছে ভগবান জীবন্ত, জাগ্রত। সর্বদা চোখের সামনে তাঁকে দেখে। তাই নিজ শরীরেরই মত তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর যত্ন নেয়। তাই ভগবান গীতায় বলছেন —

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। (গীতা ৯-২৬)

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে বসিয়া একটি সাধু ধ্যান করিতেছেন টেবিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এখন সকাল পৌনে সাতটা। আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। ১লা ফাল্গুন ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার।

শ্রীমহাপুরুষের সেবক শঙ্কর আসিয়া ডাকিলেন, জগবন্ধু মহারাজ আছেন? সাধু সাড়া দিতেই বলিলেন, মহাপুরুষ মহারাজ ডাকছেন। সাধু ভাবিলেন, হয়তো কোথাও যাওয়ার কথা বলবেন। কিন্তু তাঁর মন নিশ্চিন্ত।

মহাপুরুষ খাটে বসা। ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিতেছেন — জগবন্ধু, একটা টেবিল ক্লথ এয়েছে। এইটি স্বামীজীর টেবিলে পেতে দাও। শংকর হাতে দিতেই "যে আজ্ঞে" বলিয়া সাধু বাহির হইতেছেন। মহাপুরুষ বলিলেন সেবককে, খুলে দেখে দাও। হাতে লইয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষুনি পেতে দেব কি? হাঁ, এক্ষুনি দাও। শঙ্কর ও সাধু টেবিলে পাতিতেছেন।

বেলা নয়টা। মহাপুরুষ দোতলার দক্ষিণের অফিসঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। পাশে আর একখানা চেয়ারে ঋষিকেশের একজন সাধু। তিনি মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে ঋষিকেশ ও উত্তরাখণ্ডের নানা কথা কহিতেছেন। মহাপুরুষের সেক্রেটারী পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বসিয়া মহাপুরুষের চিঠি লিখিতেছেন। মাঝে মাঝে উনি তাঁহাদের

কথায় যোগ দিতেছেন।

সন্ধ্যা সাতটা। আরতি হইয়া গিয়াছে। একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে টেবিলে ঠেশ দিয়া উত্তরমুখী হইয়া জপ করিতেছেন। জপে মন বসিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানের নামে সব দুঃখ দূর হয়, মন আনন্দে থাকে। এই বলিয়া একটু জোরে জপ করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ বারান্দা হইতে প্যাসেজ দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছেন, আর গুন গুন করিয়া গাহিতেছেন, 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' কি মধুর স্বর — ভাবে যেন মগ্ন!

ভজনরত সাধুর মন ভগবানে স্থির হইয়া গেল — আনন্দে ভরপুর। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরই কৃপা করিয়া শ্রীগুরুর মুখ দিয়া সুখানন্দদায়ী তাঁহার নাম-মহিমা শুনাইলেন।

অনন্ত হইতে উঠিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল সেই স্বরলহরী। কিন্তু সাধুর হৃদয়ে সুখস্মৃতির একটি মধুর রেখাপাত করিয়া গেল। সাধুর কানে বাজিতেছে ঐ সুমধুর স্বরলহরী — 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।'

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আহা কি গান! 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' এই গানটি স্বামীজীর মুখে শুনে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর হলেও সেই সুরলহরী কানে বাজছে এখনও। আহা, কি যে তিনি ছিলেন। ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। মহাপুরুষ খাটে বসা র‍্যাপার জড়াইয়া। সামনে বেতের মোড়ায় বসা স্বামী অম্বিকানন্দ — টেবিলের দক্ষিণে। সাধুরা কেহ কেহ এদিক ওদিক ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন।

কথায় কথায় ছক্কু মহারাজের (স্বামী যাদবানন্দ) কথা উঠিল। স্বামী অম্বিকানন্দ বলিলেন, ছক্কু বেশ বদলে গেছে। সেই সব গেছে। সাধুভাব আসছে। ওঁদের (মা ও ঠাকুরের শিষ্যদের) কৃপা পেয়েছে কি না! ধ্যানজপও করে, যোগবাশিষ্ঠ পড়ে। পাহাড়ে চাম্বায় আছে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর কাছে। এক একবার বিচারেও লেগে যায়। বৃদ্ধ সাধু বলেন, এক একবার বেশ কথা বলে। সাধুটি বড় স্নেহ করেন। অভিমান করলে স্নেহ করে বলেন, 'আরে যাদবানন্দ, আরে বেটা।'

আর একজন বুড়ো সাধুও রয়েছেন। সকলেই মাধুকরী করে খান। কিন্তু সাধুদের জন্য সব যোগাড় আছে। সাধু গেলে সেবা করেন। ডাল চাল আটা ঘি, সব মজুত আছে। নিজেরা খান না, সাধুদের খাওয়ান।

মহাপুরুষ — বা, বা, এইতো চাই! নিজে না খেয়ে সাধুদের খাওয়ান! এই তো সাধুদের কাজ! স্নেহ করেন ছক্কুকে — বাঃ বাঃ!

স্বামী অম্বিকানন্দ — ছক্কুকে বলেন, 'তুম মহন্ত হো যাও।' সে বলে 'না মহারাজ, আমি তা পারবো না।' সাধু তখন বলেন, 'আরে বেটা, তুমকো কুছ নেহি করনা হোগা — কেবল মহাত্মা লোক আবে গে — উনলোগোকী সেবা করনা, ব্যস্।' আমি একখানা চিঠি লিখবো ছক্কুকে।

মহাপুরুষ (অতিশয় আনন্দ ও সস্নেহে) — আমিও লিখবো একখানা। আহা থাক্ থাক্ ওখানে। বৃদ্ধ সাধুর কাছে থাকা ভাল। ঠাকুরই জুটিয়ে দিয়েছেন তা। কতকগুলি বদ্ অভ্যাস ছিল কি না!

স্বামী অম্বিকানন্দ — এক বছর আছে ওখানে।

মহাপুরুষ — আহা, থাক্। আমিও লিখবো। ঠাকুর, মা তাঁর মঙ্গল করুন।

৪

সন্ধ্যার পর মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার বারান্দা হইতে প্যাসেজ দিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন। স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতেছেন। কি, আনন্দময় মূর্তি! ধর্মের জীবন্ত ভাষ্য!

মহাপুরুষ সাধুকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার বন্ধ করবে ঘর? আজ্ঞে হাঁ, বলিয়া সাধু দরজায় তালা লাগাইলেন। মন আনন্দে পূর্ণ। ভাবিতেছেন, কত ভাগ্যবলে এসব দুর্লভ সঙ্গ ও কৃপা লাভ হয়েছে আমাদের। এই-ই বুঝি 'kingdom of heaven on earth' (ধরাতে বৈকুণ্ঠ)।

বেলুড় মঠ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। এখন সকাল সওয়া সাতটা।

স্বামী স্বয়মানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি জাতিতে পার্শী, নাম ছিল দীন শা কাপাড়িয়া। ঘরে আরো সাধু রহিয়াছেন — বড় হীরেন প্রভৃতি।

মহাপুরুষ আনন্দে বলিতেছেন, ‘দীনশরণ’ আমি এই নামটি রেখেছি (হাস্য)। ‘দীন শা’ — ‘দীনশরণ’ বেশ নামটি। (কাপাড়িয়ার প্রতি) ভাল আছ? কাপাড়িয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, ভাল আছি।

মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন — ‘দীনশরণ’, ভাল না? কাপাড়িয়া এবারও মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীম — হাঁ, ঠাকুরই দীনশরণ।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

স্বামী দেশিকানন্দ — গস্‌পেল (Gospel — ইংরেজীতে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের দুই ভাগ) আপনি লিখেছেন বলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আপনাকে সর্বত্র জানে এই বইয়ের throughতে (মাধ্যমে)।

* One High Court Judge read the Gospel (Part I) seventeen times. And he told me, every time he found new light. He is a Malayalee. I am speaking of one instance, there are plenty unreported. You recognised him as God-incarnate, and we hear from you.

M. — No, it was he that made us recognise him as God. We did not recognise him. In the Gita Arjuna says, ‘স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।’ — He knows

---

* হাইকোর্টের একজন বিচারক সতের বার পড়েছেন গস্‌পেলের প্রথম ভাগ (শ্রীম দ্বারা ইংরেজীতে লিখিত 'Gospel of Sri Ramakrishna' প্রথম ভাগ)। আমাকে বললেন, প্রত্যেক বারই তিনি নূতন জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি একজন মালয়ালী। আমি তো মাত্র একটি ঘটনারই কথা বলছি। অসংখ্যই তো অজ্ঞাত রয়েছে। আপনিই ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার বলে চিনেছিলেন, আর আমরা ভাগ্যবলে আপনার মুখে শুন্‌ছি।

শ্রীম — না, উনিই আমাদের চেনালেন নিজেকে ঈশ্বররূপে। আমরা চিনি নি। গীতায় অর্জুন বলেছেন, ‘স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম’

Himself, none else knows Him. And those whom He make Him know, only they know Him. যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ — the Veda says.

♦He says in the Gita — for the salvation of the sadhus, I incarnate myself in flesh and blood whenever it is required. He comes to save, and the sadhus come to be saved.

The book-learning — it has very little value. The Avatar comes to interprete the books or scriptures. So long the scriptures were sealed books. The Lord Krishna came and interpreted the truth in the Gita.

Who will interprete the Sastras? The intellect; it is blind. Weighed in balance it is found wanting. Such is the value of the intellect. Very feeble it is. By the intellect name, fame and money can be had. So Christ says, 'do not lean on a broken reed.' The Divine interpreter comes to interprete the sastras.

জনৈক সাধু নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন —

আমাদের হয়তো তিনি সাবধান করছেন, আমরা কেবল শাস্ত্র পড়ে

(গীতা ১০-১৫) — তিনি নিজেকে নিজেই জানেন, আর কেউ তাঁকে জানে না। যাঁদের তিনি বোঝান তাঁরাই তাঁকে বুঝতে পারেন। ‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’ — বেদের বাণী।

♦ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, সাধুদের মুক্ত করতে আবশ্যক হলেই আমি মানুষরূপে অবতীর্ণ হই। উনি আসেন পরিত্রাণ করতে, আর সাধুরা আসেন পরিত্রাণ পেতে।

অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের দাম অতি অল্প। অবতার আসেন শাস্ত্রের, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে। এতকাল শাস্ত্র অবোধ্য ছিল। ভগবান কৃষ্ণরূপে এলেন আর গীতায় সত্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করলেন।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কে করতে পারে? বুদ্ধি — সে তো অন্ধ! এর ওজন করতে গেলে এটা অতি কম। এটাই হল বুদ্ধির দাম — এটা খুবই দুর্বল। নামযশ পয়সা কড়ি হতে পারে বুদ্ধি দ্বারা। তাই ক্রাইস্ট বলছেন, দুর্বলচিত্ত মানুষের ভরসা করো না! মানুষ ঐ রকম। ঐশী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাখ্যাতাই আসেন শাস্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে।

যাতে গোলমালে না পড়ে যাই। ঠাকুরের মহাবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের এগুলি পাঠ করা উচিত। তারপর সব কিছু পরিত্যাগ করে সাধন দরকার। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকাই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। সর্বদা আমাদের ঠাকুরের মহাবাক্য ধরে থাকতে হবে।

➢M. — He (Sri Ramakrishna) said, 'I knoweth no letters.' But he speaketh through this mouth such words that are listened to by learned pundits. 'One ray', he added, from the goddess of learning, dazzels the eyes of the big pundits.

"Martha, Martha, these things are good and thou art troubled with them. But one thing is needful; and Mary has chosen that, the better part of which shall not be taken away from into her", Christ said.

'These things' means rituals and ceremonies — *yag-yajna, hom* etc. And 'one thing' means love of God.

একটি সাধু (স্বগতঃ) — ঠাকুরকে ভালবাসাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

শ্রীম (পূর্ণেন্দুকে) — আন না প্রসাদ। পূর্ণেন্দু একটি এনামেলের সসারে দুইটি বড় রসগোল্লা আনিলেন। শ্রীম বলিলেন, দিন ওঁদের।

ইতিমধ্যে অপর ভক্তগণও আসিয়াছেন — শুকলাল, বলাই, সুখেন্দু, শান্তি, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। অন্য কথা উঠিয়াছে। পুনরায় ঈশ্বরীয় কথার

➢ঠাকুর বলতেন, 'আমি মুখ্যু, লেখা পড়া জানি না।' কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে এমন কথা বের হতো যে, মহাপণ্ডিতগণও নীরবে তা শ্রবণ করতেন। তিনি আরও বলতেন, সরস্বতীর এইটুকু একটু কিরণে বড় বড় পণ্ডিতের চোখ ঝলসিয়ে দেয়।

'মার্থা, মার্থা, এগুলো ভাল জিনিস, আর দুঃখ তোমার ওদের জন্যই। কিন্তু আর একটি জিনিস আবশ্যক, মেরী তাই নিয়েছে। ওর ভাল অংশ তার কখনও হাতছাড়া হবে না,' ক্রাইস্ট বলেছেন।

'এগুলো' মানে বৈদিক কর্ম — যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদি। আর 'এক জিনিস' মানে ঈশ্বরের ভালবাসা।

উদ্দেশ্যে স্বামী দেশিকানন্দ বলিলেন শ্রীমকে — 'You were telling us about God." (আপনি আমাদের ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলছিলেন।) কিন্তু রসভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় কথা আর তেমন জমিল না।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে দেখিয়া হাততালি দিয়া শ্রীম বলিতে লাগিলেন, হরিবোল, হরিবোল। পূর্ণেন্দু হ্যারিকেনটি তুলসীতলায় লইয়া গেলেন। শ্রীম এবং সাধু ভক্তগণও গেলেন। ছাদের উত্তর দিকে তুলসীকুঞ্জ। বড় মাটির টবে তুলসী ও নানা প্রকার পুষ্পতরু।

সাধু ও ভক্তরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম খ্রীস্টভক্তের মত হাঁটু গাড়িয়া যুক্তকরে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেছেন। হাত কাঁপিতেছে, তবুও যুক্তকর বারবার কপালে লগ্ন করিতেছেন। আর মুখে ঠাকুরদের নাম।

একটি সাধু (স্বগত) — কি নিষ্ঠা ভগবানের পার্ষদের! বৃদ্ধ শরীর, অন্য লক্ষ্য নাই। শরীর মন প্রাণ আত্মা সব যেন এক হয়ে লগ্ন, শ্রীভগবানের চরণকমলে। আমাদের সে নিষ্ঠা কোথায়? নিজ আচরণ দিয়ে যেন আমাদের বলছেন, শাস্ত্রপাঠ বৈধিভক্তি ভাল হলেও প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ, তাই গ্রহণ কর। কিন্তু আমাদের সে ভালবাসা কোথায়?

শ্রীম তুলসীতলা হইতে নিজের ঘরে গেলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটি হাতে লইয়া দেয়ালে টাঙ্গান দেবীর ছবিকে আলো দেখাইলেন। আবার ছাদে নয়, সিঁড়ির ঘরে বসিলেন — খাম্বার পাশে উত্তরাস্য চেয়ারে। মাথায় একটা তোয়ালে, গায়ে লং-ক্লথের পাঞ্জাবী। ভক্ত ও সাধুগণ শ্রীম-র সামনে ও পাশে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন।

অন্তেবাসী কহিলেন — বিশ্রাম করুন তো, ঘরে গিয়ে করুন।

শ্রীম বলিলেন — না, এইখানে বসেই আহ্নিক করি। শ্রীম চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন।

একজন সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, কি সংযম, কি ধৃতি, কি ঈশ্বরের ভালবাসা এই মহাপুরুষের! ঈশ্বরপ্রীতি মনটিকে পরিপূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বার্ধক্য, শারীরিক অসুস্থতা, দেহসুখ প্রভৃতির ঐ মনে প্রবেশ নিষেধ।

৫

ধ্যানান্তে শ্রীম সাধুদের কাছে মঠের সংবাদ লইতেছেন। একজন বলিলেন, আমার কয়েকটি কথা আছে জিজ্ঞাসার। শ্রীম তাঁহাকে লইয়া ছাদে গেলেন। লোহার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা হইতেছে।

জনৈক — ওঁরা শুনছি আমায় দেওঘর পাঠাতে পারেন। স্থান ভাল, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, তাই।

শ্রীম — কি, চেঞ্জে?

জনৈক — না, কর্মী হিসাবে।

শ্রীম — তা নূতন জায়গা। বেশ তো। একবার experiment (পরীক্ষা) করা যাক না। ভাল না হয় তো চলে এলেই হবে। তা ছাড়া এ সময়টা ওখানে নাকি ভাল সময়!

খুব responsible (দায়িত্বপূর্ণ)! ছেলেমানুষ সব সেখানে থাকে। অনেক গণ্ডগোল হয়ে গেছে শুনেছি। Young men (যুবকরা) বিয়ে করে নাই। বড় সাবধানে ও-গুলি বাঁচিয়ে তবে থাকতে হয়। ভারি responsible (দায়িত্বপূর্ণ)।

জনৈক — অনেকের অনেক কথা। কিছুই স্থির করা যায় না। মহাপুরুষ মহারাজ কিছু বললে implicitly (নির্বিচারে) তা পালন করা যায়। তাঁর কথায় বিশ্বাস হয়! অপরের কথায় তা হয় না। বড়ই মুস্কিল। আবার sympathy-ও (সহানুভূতিও) পাওয়া যায় না তেমন।

শ্রীম — কেন, ওরা পারছে না বুঝি?

জনৈক — যে যা ভালবাসে সে তাই বলে।

শ্রীম — তা কেমন করে হবে? সকলেই সকলের নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। সকলেই তো সিদ্ধপুরুষ নয়। নানা রকম প্রকৃতি, খুব tactfully (দেখেশুনে) চলতে হয়। আর সর্বদা prayer (প্রার্থনা)। বিবেকানন্দ বলেছেন, ঠাকুরই আমাদের hero (উপাস্য)। তাঁকেই সব বলতে হয়।

Organisation-এ (সঙ্ঘে) থাকা বড়ই শক্ত ব্যাপার। তাই tact (কৌশল) আর prayer (প্রার্থনা)। Imitation of Christ (ইমিটেশন

অব ক্রাইস্ট) লিখেছেন যিনি, তিনি ছিলেন কিনা সঙ্ঘে। তাই বলেছেন, সর্বদাই prayer (প্রার্থনা) দরকার। প্রার্থনা করা — প্রভো, অমুক কথা শুনছে না, অমুক গোলমাল করছে, ইত্যাদি।

Organisation-এর (সঙ্ঘের) কত শক্তি! মানুষকে মেরে ফেলে মনে কর। ক্রাইস্টকে মেরেই ফেললে।

আর ওদের কাছ থেকে বেশী claim (দাবী) করা উচিত নয়। তা হলে একটা grievance (মানসিক দুঃখ) থেকে যায়। তা বড় খারাপ। কোনও বিষয়ে পরামর্শ করতে হলে খুব kindly (বিনীতভাবে) করতে হয়, আর সেবা করতে হয়। মনে কর, একজনের অসুখ করেছে। কেউ নাই বা বললে — তবুও সেবা করতে হয়। তা না করে তখন ধ্যান করা — এ ভাল না।

জনৈক — ওরও বিপদ আছে। এই মাদ্রাজে যখন আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়লো এই রকম করে, যাঁদের দিকে চেয়ে করা তাঁরাই বললেন, কেন যাও করতে? যদি এই ভাবে সেবা করতে করতে শরীর পড়ে যায়, তবুও সেবা করা উচিত কি?

শ্রীম — তখন বলতে হয়, তোমরা কর। আমি আর পারছি না। শরীর দেখতে হবে। যতক্ষণ করার energy (শক্তি) আছে ততক্ষণ করা উচিত। যখন নিজেকেই সামলাতে পারা যাচ্ছে না, তখন অন্যদের বলতে হয়।

এই মঠে অত বড় একটা schism (দলভেদ) হয়ে গেল। এইটা recover (পূরণ) করতে কত বেগ পেতে হচ্ছে।

Tact (কৌশল) আর সর্বদা তাঁকে প্রার্থনা করা। Organisation এ (সঙ্ঘে) থাকতে গেলে কতকগুলি advantage (সুবিধা) যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি কতকগুলি disadvantage-ও (অসুবিধাও) আছে। আর তা না হলে গাছতলায় যেতে হয়। কিন্তু তাতেও কত অসুবিধা। কাল কি খাব তার ঠিক নাই।

জনৈক — পূর্বে কত memory (স্মৃতিশক্তি) ছিল। এখন কিছু মনে রাখতে পারি না।

শ্রীম — ও শরীর খারাপ বলে, অমন হয়। আর self-seeking

(সুবিধাবাদী) হলে মনের উন্নতি হয় না। তাই সেবা করতে হয় যতক্ষণ পারা যায়।

জনৈক — আমি দেখেছি মাদ্রাজে, মন ভাল থাকে সেবা করলে। কিন্তু শরীর তো তা মানে না।

শ্রীম — অসুখ থাকলে আলাদা কথা। আসুন না এইখানে। এই বলিয়া শ্রীম সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গীতায় —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯-২৭)

দেখ, বলছেন — যা কর, সব আমাকে অর্পণ কর — তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। যা কর, যা খাও, সব দাও, general termএ (সাধারণ ভাবে) বলছেন। তপস্যা করছ (চক্ষু বুজিয়া ধ্যানের অভিনয় করিয়া) এমন করে, তাও আমাকে দাও। তবেই হবে। তা না হলে খানিকটা আমার নিজের জন্য, খানিকটা তাঁর জন্য — তা হলে হবে না। সব তাঁর জন্য করতে হবে।

গুরূপদিষ্ট কর্ম করতে হয়। গুরু যা বলেন তাই করতে হবে। তবেই তোমার caseটা (অবস্থাটা) represent (উপস্থাপিত) করা যায়। তবুও যদি বলেন, তবে করতেই হবে। যদি পড়াতে হয় তা-ও তাঁর জন্য।

(খানিক চিন্তার পর) তবে বড় কঠিন নিষ্কাম কর্ম, বড় কঠিন। কিন্তু বলেছেন আবার, একটু করলেই হবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য' — এই নিষ্কাম কর্মের একটুতেই হবে। কি হবে? 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করবে। কি সে মহাভয়? জন্মমৃত্যু চক্র। পরিত্রাণ মানে মুক্তি। একটু নিষ্কাম কর্ম করতে পারলেই চিত্ত শুদ্ধ হবে। তা হলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি। তা থেকে মুক্তি। নিষ্কাম ভাবে না করলে শুভাশুভ ফল পেতে হবে। তাতেই জন্মমরণ চক্রে পড়তে হবে। জন্মমরণই সকল দুঃখের কারণ। তাই মহাভয়। 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' — এইটি হল message of hope (আশার বাণী)।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। চোখে মুখে গুপ্ত হাসি। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এ আর একটি আছে — যেমন সীতাপতি

মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ)। মাঝে মাঝে গিয়ে একটু করে দিয়ে আসেন — নিষ্কাম কর্ম।

অনেকদিন নির্জনে ছিলেন। আবার উদ্বোধনের বিবাদের সময় কিছুদিন করেছিলেন। আর ওদিকে (উত্তর-পশ্চিম ভারতে) মঠের কাজে আর তীর্থে। ও একটি (থাক) আছে।

পূর্ণেন্দু — উনি বলেন, বরাবরই করবো? বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

শ্রীম (সহাস্যে) — তা বলে ছাড়বে কেন?

ক্ষণকাল ভাবান্তর। আবার কথা।

শ্রীম (শুকলালকে লক্ষ্য করিয়া) — এই যারা সংসারে থাকে, ভোগ নিলেই বিপদ — বদ্ধ হয়ে গেল। আর ভোগ না নিলে তা হয় না।

(সকলের প্রতি) মঠেই থাক আর বাড়িতেই থাক, ভোগ নিলেই বদ্ধ হয়ে গেল।

দুর্গাপদ মিত্রের প্রবেশ। শ্রীম আহ্বান করিতেছেন, আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। আপনি star-এর (তারকার) মত দেখা দিয়ে (কুম্ভে) চলে গেলেন।

দুর্গাবাবু শ্রীম-র হাতে একটি ম্যাগাজিন দিলেন। ইহাতে কুম্ভের নানারকম সাধুসন্তের ছবি আছে। শ্রীম পাতা উল্টাইয়া অতি নিবিষ্টভাবে দেখিতেছেন। বলিতেছেন, এই আমাদের কুম্ভ দর্শন হলো। অপরের কাছে শুনলেও বার আনা চৌদ্দ আনা হয়, যদি খুব strong imagination (প্রবল কল্পনাশক্তি) থাকে। এ মনে কর তার উপর ছবিদর্শন। সায়েন্সের এই সব good application (উত্তম ব্যবস্থা) আমরা দূরে বসে দেখছি।

আর একটা আছে ‘দিব্যচক্ষু’। সেটা যৌগিক শক্তি, মনের ব্যাপার। বেদব্যাস সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন সেই শক্তি। তবে দিল্লীতে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখতে পেয়েছিলেন। আর ধৃতরাষ্ট্রকে তাই বলতেন। গীতার জন্ম ঐতে হয়। সায়েন্সও অনেক এগুচ্ছে। এখানে বসে দূরের সংবাদ শোনা যায়। আবার বলা যায় টেলিফোনে। আবার wireless (বেতার যন্ত্র) হচ্ছে। কালে হয়ত দেখাও যাবে দূরের জিনিস।

এসব হচ্ছে material science (জড়বিজ্ঞান)। আর mental science (মনোবিজ্ঞান), আবার তার উপর spiritual science

(আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান)। West-এ (পশ্চাত্ত্যে) material science-এরই (জড়বিজ্ঞানেরই) experiment (গবেষণা) চলছে এখন। তারপর mental science (মনোবিজ্ঞান) — প্রাচীন কালে যুদ্ধে তার প্রয়োগ দেখা যায়। Spiritual science-এর (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের) নাম ব্রহ্মবিদ্যা। তাতে ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন হয়।

একসঙ্গে চললে তিনটাতেই সুফল হয়। নইলে কুফল। West-এর (পাশ্চাত্ত্যের) এরা কেবল material science (জড়বিজ্ঞান) নিয়ে আছে। Spiritual Science (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান) সঙ্গে না থাকলে ওতেই ধ্বংস হবে — বুদ্ধিবিভ্রান্ত হয়ে। তারই নমুনা দেখা যাচ্ছে। এই First World War-ই (প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধই) তার দৃষ্টান্ত।

রাত্রি প্রায় আটটা। স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠে যাইবেন। পূর্ণেন্দু আলো লইয়া সাধুদের সঙ্গে নিচের তলায় গেলেন। শুকলাল পাথেয় বাবদ দুইটি টাকা দিলেন।

সাধুরা কর্মযোগ করেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবিতেছেন, শ্রীম খুব জোর দিলেন গুরূপদিষ্ট কর্মে। আর ভরসা দিলেন গীতার কথায়। একটু নিষ্কাম কর্ম করতে পারলেই কাজ হবে ‘স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ’ (গীতা ২-৪০)।

বেলুড় মঠ।
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তার মালা এসব কথা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। মধ্যস্থলে চেয়ারে শ্রীম বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে জোড়া বেঞ্চ, উপরে শতরঞ্জি। ইহাতে সাধুরা বসেন। শ্রীম-র ডান হাতেও বেঞ্চ পাতা। তাহাতে ভৌমিক, পূর্ণেন্দু আর কয়েকজন ভক্ত উপবিষ্ট।

আজ ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। এখন পাঁচটা। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ ও দিনাজপুরের মণীন্দ্র মহারাজ ধর্মতলায় দাঁতের ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আসিয়াছেন। দেখিয়াই শ্রীম অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে জোড়া বেঞ্চিতে বসিতে বলিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া বসিলেন। কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইল। এখন অন্যান্য কথাবার্তা হইতেছে।

জগবন্ধু মহারাজ — ঠাকুরের তিথিপূজাতে মঠে যাবেন কি?

শ্রীম — ইচ্ছে তো আছে। দেখি কি হয়। একবার ইচ্ছে হল কুম্ভে চলে যাই (প্রয়াগে)। যাই তো এখনি যাই। ও মা, সে ইচ্ছাটি গেল অমনি। এদিকে একতলা দোতলায় উঠতে পারছি না। এমন সব। মন নিয়ে কথা কি না। মঠে যেতে তো ইচ্ছে হয় — ঝাঁপ দেয় যেমন পতঙ্গ আগুনে।

উটি থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছে ঠাকুরের উৎসবের। ৯ই মার্চে উৎসব — চিদ্‌ভবানন্দ পাঠিয়েছেন!

চিঠিখানা হাতে লইয়া খুলিলেন। পড়িয়া বুক পকেটে রাখিয়া দিলেন।

শ্রীম — উলসূর (ব্যাঙ্গালোর) থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছে। কে আছেন ওখানে?

জগবন্ধু — তাম্বি।

শ্রীম — না।

জগবন্ধু মহারাজ — তাহলে স্বামীজীর শিষ্য যোগেশ্বরানন্দজী।

শ্রীম — হাঁ। তিনিও ওখানে উৎসব করছেন। (জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি) আপনার কোথাও যাওয়া স্থির হল কি? ডাক্তারের কাছে আসছেন না এখন?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে না। আগের মত নয়।

শ্রীম — এখন কে ডাক্তার — অমরবাবু নন?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে না, শ্যামাপদবাবু।

শ্রীম — কি খান?

সন্ন্যাসী — রাত্রে এক পোয়া দুধ আর তিনখানা রুটি। আর দিনে ঝোলভাত।

শ্রীম — রুটি বেশী খেতে পারেন — ইচ্ছা হয়?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে, ইচ্ছে হয়। তবে হজম করা শক্ত হয়। তবে দুধ মনে হয় খেতে পারি বেশী। Liquid (তরল) বেশী খাওয়া চলে।

শ্রীম — সকালে দুধ খান?

সন্ন্যাসী — না। ঘোল খেতে বলেছেন। সকলের জন্য ঘোল হয় যেদিন পাই, সে দিন খাই। সর্বদাই strain (শরীর ও মনের উপর চাপ)।

শ্রীম — কথায় বলতে গেলে, রাখাল মহারাজ বলতেন — সন্ন্যাসী মানে বেওয়ারিশ মাল।

কিন্তু, এ (সন্ন্যাস) চিরকাল থেকে চলে আসছে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মহারাজ, আমি আপনার বংশে জন্মাই নাই। আপনি ভাববেন না। আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি। বুদ্ধদেবের বাবা বলেছিলেন কি না, তুমি আমার বংশে জন্মে ভিক্ষা করে খাচ্ছ? তাতেই বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মহারাজ আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি।

(একটু ভাবিয়া) গিন্নী জানে, কোন হাঁড়ির উপর কোন হাঁড়ি রাখতে হয়। ভাবতে হবে না। তিনি যেকালে এতগুলি আশ্রম করেছেন — এ তাঁরই lookout (দেখা কর্তব্য) — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এসব আশ্রম তিনিই করেছেন, তিনিই ভাবছেন।

দেখ না, সূর্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রোজ। হাওয়া করে দিয়েছেন, তবে

প্রাণধারণ হয়। আবার মাছের তেলে মাছ ভাজছেন। ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছেন ঢেলা।

নিরামিষ (সন্ন্যাসী) আবার আমিষ (গৃহস্থ)। যারা নিরামিষ তাদেরও দেখছেন। আবার যারা আমিষ, তাদের বলেছেন, তোমরা এঁদের সেবা করবে, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। এমনতর ব্যবস্থা তাঁর!

শ্রীম (ভৌমিকের প্রতি) — এই যে আপনি চেষ্টা করছেন কর্মের জন্য, এও তিনিই দিচ্ছেন।

ভৌমিক — আপনি বলেছিলেন সাদা (পাশের) বাড়িতে — যে মন একটা বিষয় ভাবে, সে তো অতি সহজ। কিন্তু যে দশটা ভাবে সেই তো বড় — যেমন নেপোলিয়ান।

শ্রীম — হাঁ, সে অবতারাদি পারেন। ওঁরা (নেপোলিয়ান প্রভৃতি) আসক্ত হয়ে করেছিলেন। কিন্তু অবতারাদি অনাসক্ত হয়ে করেছেন। সে আবার কেমন? স্নান আহার ছেড়ে দিয়ে। ‘অতন্দ্রিত’ — দেখ না, বিশ্রাম নাই। কাজ করছেন, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে।

নেপোলিয়ানও বলেছিলেন সেন্ট হেলেনায়, ডাক্তারের ছেলেদের ম্যাপে জেরুসালেম দেখিয়ে — He is victorious – not I (তিনিই চিরবিজয়ী, আমি নই)। মানে ক্রাইস্টের জয়।

শ্রীম আনমনে কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (স্বগত, সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া) — বুদ্ধদেব বলছেন, মহারাজ আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি। আপনার বংশে জন্মাই নাই।

শ্রীম ভাবমত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরাচ্ছে দিবানিশি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হতে হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

শ্রীম বারবার আখর দিতেছেন, ‘আপনি থাকি কলের ভিতরি কল

ঘুরাচ্ছে দিবানিশি’। যেন চোখের সামনে দেখিতেছেন মাকে — তিনি কল ঘুরাইতেছেন। চোখে মুখে আনন্দের ছটা। প্রশান্ত নির্ভয় ভাবে রঞ্জিত।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম আসন ছাড়িয়া ছাদের উত্তর ধারের তুলসীকুঞ্জে গিয়া বসিলেন। সাধু ও ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কেহ প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। অধিকাংশই শ্রীম-র সঙ্গে বসা। সাধুরা আসিয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। আধ ঘন্টা পরে শ্রীম আসিলেন।

লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। ইনি উড়িষ্যাবাসী, ঠাকুরের আশ্রমে পাচকের কাজ করেন। মঠের দীক্ষিত ভক্ত। মাদ্রাজে কয়েক বছর ঠাকুরের ভোগ রান্না করিয়াছেন। সম্প্রতি কর্ম নাই। শ্রীম স্বামী নিত্যাত্মানন্দকে বলিতেছেন, দেখুন, এর একটা কর্ম যদি হয় কোনও আশ্রমে। মাদ্রাজ মঠে বেশ ছিল।

হিমাংশু আসিলেন, সঙ্গে একটি ভক্ত। ভক্তটি কতকগুলি তালপাতার পাখা আনিয়াছেন, আর মিষ্টি। আর একজন যুবক ভক্ত আসিলেন। নাম সুন্দর বসু। চেহারাটিও সুন্দর। লক্ষ্মীবিলাস তৈলের সত্ত্বাধিকারীদের ভাগিনেয়। মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহারও হাতে মিষ্টি। শ্রীম বলিতেছেন পূর্ণেন্দুকে, মিষ্টি ঠাকুরদের দিতে হবে। হাত ধুয়ে রেখে দিন। পাখাগুলি মঠে দিয়ে দাও। গঙ্গা দিয়ে রাখ — ত্রিবেণী-সংগমের গঙ্গা।

সাধুরা জোড়া বেঞ্চে বসা — বিনয়, মণীন্দ্র ও জগবন্ধু। সুন্দরও তাঁহাদের সঙ্গে বসিলেন শ্রীম-র কাছে। সাধুদের সামনে পশ্চিমাস্য বসা শুকলাল, মুকুন্দ, পূর্ণেন্দু, লক্ষ্মণ, হিমাংশু প্রভৃতি অনেক ভক্ত। শ্রীম-র সামনেও দুই সারি বেঞ্চি। তাহাতেও ভক্তগণ অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীম একবার ঘরে গেলেন। মিষ্টিটা দুইভাগ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এক ভাগ যাইবে মঠে, আর এক ভাগ ঠাকুরবাড়ি। ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। সুন্দরের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন। সুন্দরের গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, গোঁফ কামানো, অতি ফর্সা রং। বয়স তেইশ চব্বিশ। ডাক্তাররা বলিতেছেন, তাহার ব্লাড-প্রেসার হইয়াছে।

শ্রীম (সুন্দরের প্রতি) — দেখুন, এই সব কথা, ব্লাড-প্রেসার আদি, ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে। আমরা ছেলেবেলায় এসব নামও শুনি নি।

আজকালই কত সব বলছে ডাক্তাররা। বুঝলেন, ঝেড়ে ফেলে দিন। De-hypnotised (অসম্মোহিত) হয়ে যান।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন — যেন নিজের ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। যেন তাঁহার ভিতর হইতে আর একজন শ্রীম-র মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর এত ভালবাসেন মানুষকে যে, নিজে মানুষ হয়ে আসেন জ্ঞান উপদেশ করবার জন্য — 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্' (গীতা ৪৮)। তা না হলে সাধুরা দাঁড়ায় কোথায়?

তিনই সব দেখছেন। মানুষের ভাবতে হবে না। সূর্য, হাওয়া — সব দিয়েছেন। তবে প্রাণটি থাকবে।

তারপর এ কি একটা life (জীবন) ? — Eternal life (অনন্ত জীবন) রয়েছে।

একজন বলেছিল ওঁকে, (ঠাকুরকে) — মশায়, পরকাল আছে কি না? তিনি বললেন, ওগুলো অত ভাবছো কেন? আম খেতে এসেছ, আম খাও। আরও বললেন, আমি শুনে রেখে দিয়েছি যতক্ষণ হাঁড়িটা কাঁচা থাকে কুমোর ততক্ষণ চাকে ফেলে বারবার। কিন্তু পেকে গেলে আর ওর দ্বারা কাজ হয় না।

দেখেন নি, কুমোররা হাঁড়ি করলো, ভেঙ্গে গেল। তখন আবার চাকে ফেলে দিল। কিন্তু পুড়ে লাল হয়ে গেলে তখন আর এর দ্বারা কাজ হয় না।

বলেছিলেন, শুনে রেখে দিয়েছি। মানে, তার importance (প্রাধান্য) নেই।

(সকলের প্রতি) — পণ্ডিতগুলো কত রকম করে বলে! কিন্তু অবতারের কথা দেখ — বালকের মত। গিন্নী জানেন সব। তিনিই জানেন যিনি জন্ম দিয়েছেন। মানুষের ভাবতে হবে না কিছু, নিশ্চিন্তি।

যদি বল, (মানুষ) চেষ্টা করবে না? তার উত্তর, তিনিই চেষ্টা দেন। তবে অহংকারটা যত দিন রয়েছে, প্রার্থনা করতে হয় তাঁকে। সব সংশয় তিনি মিটিয়ে দিয়ে গেছেন — 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'

এত ভালবাসা, যে নিজে অবতীর্ণ হন — সাধুদের উদ্ধারের জন্য।

তা না হলে সাধুরা দাঁড়ায় কোথায় বল? জ্ঞান ভক্তি উপদেশ দেবার জন্য আসেন।

জনৈক (স্বগত) — ভগবান অবতার হয়ে এসে সাধু তৈরী করেন। আর ভক্ত। ভক্তরা সাধুদের সেবা করবে। সাধুরা ভক্তদের জ্ঞান ভক্তির কথা বলবে। পরস্পর সম্বন্ধ। আজ আমার এতদিনের সংশয় মিটলো, সাধু যোগসূত্র — ঈশ্বর ও ভক্তদের।

শ্রীম — 'কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।'* (গীতা ৬-৩৮)

একেবারে জ্ঞানে আরূঢ় হয়ে না থাকতে পারলে alternative (উপায়ান্তর) ভক্তসেবা। এতে সাধুর কর্মসংস্কারও কাটে আর ভক্তদেরও কাজ হয়।

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।'** (গীতা ৩-১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনকে সংসারধর্ম থেকে উঠিয়ে ব্রহ্মে লগ্ন করলেন। অর্জুন ঐ অবস্থায় অপ্রতিষ্ঠিত। তাই বিনাশের ভয়ে বললেন — উভয় দিক থেকেই বিভ্রষ্ট হয়ে আমি কি ছিন্নমেঘের একটা টুকরোর মত বিনষ্ট হয়ে যাব? যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম সেখান থেকে মনকে ভুলিয়ে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উত্থিত করেছ। আমি কিন্তু ওখানে অপ্রতিষ্ঠিত। 'ইতঃ নষ্ট তত ভ্রষ্ট'-এর ন্যায়, আমি না সংসারের, না ঈশ্বরের।

২

শ্রীম জগবন্ধু মহারাজকে ডায়েরী পাঠ করিতে বলিলেন।

জগবন্ধু মহারাজ পড়িতেছেন।

---

*হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কর্ম ও উপাসনা — এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি দুইটি বৃহৎ মেঘের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতর মেঘখণ্ডের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না?

** হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষসাধন দ্বারা কল্যাণ লাভ কর।

বেলুড় মঠ। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। দোতলার বারান্দা। সকাল প্রায় আটটা। মহাপুরুষ, প্যাসেজ ও স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন দক্ষিণাস্য। গায়ে গরম গেঞ্জি। তাহার উপর চাঁপা রং-এর গরম পাঞ্জাবী — পায়ে ভেলভেটের চটি। কেডুলা (ব্রহ্মচারী মঙ্গল চৈতন্য) আসিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন।

কেডুলা প্রণাম করিয়া উত্তরাস্য মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে স্বামীজীর ঘর, বাঁ হাতে প্যাসেজ। প্যাসেজের দক্ষিণ ও উত্তরে দাঁড়ান স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু ও ভজহরি (স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ)। শৈলেশ (স্বামী কৈলাসানন্দ) বারান্দার ছোট ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সহাস্য বদনে কেডুলাকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

*Mahapurusha — How do you do — quite well?

Kadula — Yes, Maharaj. Thanks. How are you?

Mahapurusha — The body is invalidated — very weak.

Kadula — But the Spirit —

Mahapurusha — Yes, the Spirit is alright. (In a cheerful inspired mood) That is alright.

Swami Omkarananda, Saswatananda and Nepal Maharaj of Kasi Enter.

---

*মহাপুরুষ — কেমন আছ — ভাল তো?

কেডুলা — আজ্ঞে হাঁ। আপনি কেমন?

মহাপুরুষ — শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে — অচল। তাই দুর্বল।

কেডুলা — কিন্তু আত্মা—

মহাপুরুষ — হাঁ, আত্মা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। (সহাস্য বদনে উদ্দীপিত ভাবে হাঁ, ও টি নিশ্চয়ই ঠিক আছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ, শাশ্বতানন্দ ও কাশীর নেপাল মহারাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

Mahapurusha — This life is only a buble, a quarter. In the Vedas, in the Gita, the Lord says — a quarter is this world and three-fourths are outside of it.

This is a buble — this life in the world. The spirit is Eternal. That life is Eternal.

Kadula — If God is knowledge, then why is this ignorance in this world?

Mahapurusha — Nobody can answer this question. God is and ignorance is. That is a fact. But by His Will one can go out of this ignorance.

Kadula — By trying, by struggle —

Mahapurusha — But the power of struggle also is (pointing the heart by the right hand) here in the soul.

(Placing his right hand on his chest) – By the Mother's Will, we have gone out of this ignorance.

মহাপুরুষ (কেডুলার প্রতি) —এই জীবনটা একটি জলবুদ্‌বুদ্‌ বই তো নয় — মাত্র এক-চতুর্থাংশ। বেদ ও গীতামুখে ভগবান এই কথাই বলেছেন — মাত্র এক-চতুর্থাংশ হচেছ এই জগৎ। বাকী তিনভাগ এই জগতের বাইরে।

হাঁ, এই শরীরটা একটা জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র — এই সংসারী জীবনটা। আত্মা শাশ্বত। ঐ জীবনটা অনন্তকাল স্থায়ী, সনাতন।

কেডুলা — ঈশ্বর যদি জ্ঞানস্বরূপ হন তবে তাঁর সৃষ্ট এই জগতে এত অজ্ঞানতা কেন?

মহাপুরুষ — এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। ঈশ্বর আছেন আর অজ্ঞানতা আছে। এটা একটা সত্য। কিন্তু ঈশ্বরের ইচছায় একজন এই অজ্ঞানতা অতিক্রম করতে পারে।

কেডুলা — চেষ্টা দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা —

মহাপুরুষ — কিন্তু সংগ্রামের শক্তিও (দক্ষিণ হস্তে হৃদয় স্পর্শ করিয়া) এখান থেকে আসে — হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী পুরুষ থেকে।

(স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া) — মায়ের ইচছায় আমরা এই অজ্ঞানের পরপারে চলে গেছি, এই অজ্ঞান অতিক্রম করেছি।

Yes, by Divine Will many have gone, many are going and many will go out of this ignorance.

But this question (why there is ignorance) can not be answered.

A Sadhu (to himself) — God and Ignorance are two quite different things. God has become the man. By His Will the man is drowned in ignorance. By His Will again man is lifted up from this ignorance and shown his real nature which is God.

God + Ignorance = Man

God - Ignorance = Man-God, Jivanmukta.

We must pray to Him constantly to take us out of this ignorance. Sri Ramakrishna by his touch has pulled up so many drowned souls out of this ignorance. Swami Vivekananda and all his disciples are lifted up from this ignorance. Even now Mahapurusha said, 'By the Mother's Will, we have gone out of this ignorance.'

হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকে এই অজ্ঞান অতিক্রম করেছে, অনেকে অতিক্রম করছে। এবং অনেকে এই অজ্ঞান অতিক্রম করবে ভবিষ্যতে।

কিন্তু এই প্রশ্নের (কেন এই অজ্ঞানতা) কোন উত্তর নাই।

একজন সাধু (স্বগত) — ঈশ্বর ও অজ্ঞানতা — এই দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীব অজ্ঞানে নিমজ্জিত। আবার ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই জীব অজ্ঞানতা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। আর তখনই তাঁর সত্যস্বরূপ দর্শন হয়। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

ঈশ্বর + অজ্ঞানতা = মানুষ, জীব।

ঈশ্বর - অজ্ঞানতা = নরদেব, জীবন্মুক্ত।

আমাদের সর্বদা তাঁর নিকট প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমরা এই অজ্ঞানতার পরপারে যেতে পারি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটিমাত্র স্পর্শের দ্বারা এই অজ্ঞানতায় নিমজ্জমান বহুজনকে অজ্ঞানতার পরপারে নিয়ে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদদের তিনি এই অবিদ্যার পরপারে নিয়ে গিয়েছেন। এইমাত্র মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, মায়ের ইচ্ছায় আমরা এই অবিদ্যার পরপারে গিয়েছি।

Will Thakur lift us also up from this ignorance? May He make us so!

It is extremely clear now from this open declaration of Mahapurusha that, this depends entirely on His Will. We have no other way but to pray, to weep, to completely surrender to Him for getting back our Divine sight.

But we can not keep up this attitude of complete surrender in mind. We forget, so we become devoid of peace.

We forget Him in activity. Leisure and meditation are required. And yet we can't go out of this activity. Being in activity let us try and pray — Lord, do not delude me, take me out of this ignorance. Mother, thou are ignorance too. Show unto us thy real self and also the real self of Thakur.

ঠাকুর কি আমাদেরও এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে উত্তীর্ণ করবেন? তিনি কৃপা করে আমাদের অজ্ঞান অবিদ্যার পরপারে নিয়ে যান, তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

মহাপুরুষ মহারাজের এই অকপট উক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়েছে যে, এটি কেবলমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাধীন। অকপট প্রার্থনা, প্রেমাশ্রু বিসর্জন ও সম্পূর্ণ শরণাগতি ব্যতীত আর কোনও পথ নাই, আমাদের দিব্য অধিকার পুনরায় প্রাপ্তিতে।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ শরণাগতির ভাবটি আমরা সর্বদা মনে জাগ্রত রাখতে পারি না। আমরা ভুলে যাই। তাইতো আমাদের এই অশান্তি।

কর্মপ্রবাহে পড়ে আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই। অবসর ও ধ্যানের আবশ্যক। কই, আমরা কি এই কর্মপ্রবাহের বাইরে যেতে পারি — কর্ম না করে থাকতে পারি? কর্মপ্রবাহে থেকেই আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা করতে হবে — প্রভো, আমাদের ভুলিও না। আমাদের অবিদ্যার পরপারে নিয়ে যাও। মা, তুমিই তো অবিদ্যারূপিণী! মা, তোমার স্বরূপ আমাদের দর্শন করাও, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্যস্বরূপও দর্শন করাও। কৃতার্থ কর মা!

All are speechless. Everything is clam. Mahapurusha's words are vibrating in the atmosphere.

The morning of the winter has flooded the verandah with sweet sun-shine. The minds of the Sadhus are also kindled by the wisdom's rays of the seer standing before them!

শ্রীম — ঠাকুর তাই তো সর্বদাই বলতেন, সাধুসঙ্গ সংসারী লোকের সর্বদাই দরকার, সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার, তবে সংসারীদের বিশেষতঃ। রোগ লেগেই আছে — কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।

৩

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। দোতলার বারান্দা। এখন সন্ধ্যা সাতটা। ঠাকুরঘরে আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধুরা কেহ কেহ মহাপুরুষের কাছে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ প্যাসেজের বাম হাতে ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। গরম র‍্যাপারে তাঁহার শরীর ঢাকা। সম্মুখে গঙ্গা। স্বামী অম্বিকানন্দ বাম দিকে মোড়ার উপরে বসিয়াছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ রেলিং-এ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আর স্বামীজীর ঘরের সেবক প্যাসেজের মুখে দাঁড়ান উত্তরাস্য। দরজা ভেজান — সামান্য একটু ফাঁক আছে।

সকলেই নির্বাক। সকলেই প্রশান্ত। মহাপুরুষের দিব্যবাণী আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মঠের দ্বিতলের বারান্দা শীতের প্রভাতের সুমধুর উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত। সাধুদের হৃদয়কমলও উদ্ভাসিত সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রহ্মদ্রষ্টা মহাপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিমল কিরণে।

স্বামীজীর কথা উঠিয়াছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, ‘আমি বলতে গেলে বলবো ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য একমাত্র স্বামীজীই। আর কেউ নয়।’

মহাপুরুষ (উদ্দীপিত হইয়া) — তাই তো, তাই তো! তাঁর কি capacity (শক্তি)! আমরা ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তাঁর capacity (শক্তি) ছিল। তাই তো তাঁকে দেখলে কেমন হয়ে যেতেন ঠাকুর। অখণ্ডের ভাবে মেতে যেতেন। খুচরা ভাব সব ভুলে যেতেন।

একবার ঠাকুরের উৎসব হয় দক্ষিণেশ্বরে। তখন ঐ উত্তর-পূর্বের লম্বা বারান্দায় বসা হতো। ভক্ত তো এতো ছিল না — এই পঞ্চাশ ষাটজন। স্বামীজী এলেন। অমনি ঠাকুর বললেন আহ্লাদে, ‘ঐ নরেন এসেছে।’ তারপর নিজের পা দু’খানি ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। স্বামীজীও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তা ধারণ করলেন। ঠাকুর ওঁর (স্বামীজীর) ভেতর একটা শক্তি দেখতে পেতেন।

আমরাও ধন্য! এমন সব লোকের সঙ্গে থাকা গেছে, আনন্দ করা গেছে, খাওয়া গেছে! আমরা ও সাধারণ লোক ধন্য!

স্বামীজীর কাজ তো দশ বছর — উনত্রিশ থেকে উনচল্লিশ। তার মধ্যে তিন বছর তো অসুখ। মাত্র সাত বছর কাজ করেছেন।

আজকাল ওয়েস্টে বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি নিচ্ছেন অনেকগুলি পণ্ডিত। তাঁরাই প্রথমে নেন — intellectually (জ্ঞান-বুদ্ধিতে) তো নেবে প্রথম। তবে তো ধারণা হবে। পরে অনেকে নিচ্ছে।

মহাপুরুষ (ওঁকারানন্দের প্রতি) — তুমি পড় না ‘প্রবুদ্ধ ভারত’?

স্বামী ওঁকারানন্দ — না। তবে বড় লেখকের প্রবন্ধ থাকলে পড়ি।

মহাপুরুষ — হাঁ। অশোকানন্দ লেখে ভাল। আর সংগ্রহগুলিও ভাল।

স্বামী অম্বিকানন্দ — অশোকানন্দ কে?

মহাপুরুষ — যোগেশ, মাদ্রাজের যোগেশ।

স্বামী ওঁকারানন্দ — প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যাবাবু বেশ লিখেছেন। পড়ি নাই, শুনেছি।

মহাপুরুষ — খুব ভক্ত ঠাকুর স্বামীজীর। কিন্তু শুধু ভক্ত টাইপের

লোক নয়। বুঝে সুঝে তবে লেখে। আর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে।

সকলেই নীরব। মহাপুরুষও কিছুকাল মৌন রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ (সহাস্যে) — মাদ্রাজ থেকে আসা যাচ্ছে জাহাজে, স্বামীজীর সঙ্গে। তখন তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন।

স্বামী অম্বিকানন্দ — আচ্ছা, গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে ছিলেন কি?

মহাপুরুষ — হাঁ, গুপ্ত সঙ্গেই ছিল। মাদ্রাজ থেকেই সঙ্গে আসে গুপ্ত। আর নিরঞ্জন কলম্বো থেকে। আমিও কলম্বো থেকে আসি। জাহাজে আমি টল্‌ছি। স্বামীজী আমায় (বগল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া) এমন করে ধরে ফেললেন (হাস্য)! তখন দুটি লোক ও একটি মেম 'ডেকে' বেড়াচ্ছিলেন।

খুব খিদে হয় সাগরে বেড়ালে। Oxygen (অক্সিজেন) রয়েছে কিনা। ওরা বলে ozone (ওজোন)।

স্বামী ওঁকারানন্দ — প্রথমে বজবজে আসেন। তারপর মঠে।

মহাপুরুষ — সব যাত্রী নেমে গিছিল! কেবল আমরা রয়ে গেলাম রাত্রে জাহাজেই। উঃ কি মশা! অনেক খাবার নিয়ে গিছলো ছোট গোপাল — বরদার ভাই।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। দ্বিতলের বারান্দা। আরতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ স্বামীজীর ঘরের পাশে বসিয়া আছেন ইজি-চেয়ারে, উত্তরাস্য। স্বামী বামদেবানন্দ গামছা দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছেন। সামনে স্বামী অম্বিকানন্দ উপবিষ্ট মোড়ায়। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'নাথের পো' ও সুদর্শন আসিয়াছেন। সুদর্শন দর্জির কাজ করেন। সুদর্শন মহাপুরুষের সঙ্গে কাঠের কাজ, ফটোগ্রাফির কাজ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা কহিতেছেন। মহাপুরুষ বলিলেন, দর্জির কাজে সর্বত্রই পয়সা আসে। মানুষ জামা তৈরি করাবেই।

স্বামী পুণ্যানন্দ আসিয়া স্বামী অম্বিকানন্দকে কানে কানে জিজ্ঞাসা

করিলেন, রেডিও হবে কি না? নিচে ভিজিটার্স রুমে রেডিও। স্বামী অম্বিকানন্দ বলিলেন, তোমরা ফিট কর। (মহাপুরুষের প্রতি) আপনার কষ্ট হবে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছে। মহাপুরুষ বলিলেন — না, আমি ঘরে যাব। করুক না।

মহাপুরুষ ঘরে আসিয়াছেন, ইজি-চেয়ারে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ দরজার পাশে ঘরে দাঁড়ান। একজন সাধু সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। ঘরে নীল বাতি জ্বলিতেছে। সেবক মতি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৩শে, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। বেলুড় মঠ। সকাল আটটা। একটি সাধু স্বামীজীর ঘর পরিষ্কার করিতেছেন। মহাপুরুষের সেক্রেটারী স্বামী গঙ্গেশানন্দ আসিয়া বলিলেন, তোমাকে অমরবাবুর বাড়ি যেতে হবে মহাপুরুষের ওষুধ আনতে।

শ্রীমহাপুরুষ বারান্দায় বসা প্যাসেজের পাশে চেয়ারে, পূর্বাস্য। সেবক স্বামীজীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাপুরুষের কাছে দাঁড়াইলেন।

মহাপুরুষের সেবক ক্ষিতীন্দ্রের হাতে একখানা বড় সাদা পাথরের থালা। ক্ষিতীন্দ্র বলিলেন, জগবন্ধু মহারাজ যাবেন। (সাধুর প্রতি) হাঁ জগবন্ধু, তুমি যাবে? সম্মতি জানাইলে বলিলেন, এই থালাটি অমরবাবুকে দিও, আর বলো আমি দিয়েছি। ওতে যেন ভাত খায়। সাধু 'আজ্ঞে আচ্ছা' বলিয়া থালা লইয়া রওনা হইলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, ইস্টিমারে উঠবার সময় আর নামবার সময় খুব সাবধান হবে। একজন অন্য লোক কেউ সঙ্গে গেলে ভাল হতো। সাধু রুগ্ন, তাই অত ভাবিতেছেন।

সাধু বলিলেন, আজ্ঞে আমিই পারবো। মহাপুরুষ পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা, এখানে কেউ একজন গিয়ে স্টিমারে তুলে দেবে? সাধু বলিলেন, না দিলেও হবে। মহাপুরুষ তবুও বলিলেন, এই যে কালীসদয়। সে যাক্ না। কালী সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বেলুড় স্টিমারে তুলিয়া দিলেন।

যাইবার সময় শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, নামবার সময় একজনকে বলো,

অনুগ্রহ করে আমার এটা একটু ধরুন। আমি নামবো।

কুঠিঘাটে স্টিমার হইতে নামিবার সময় সাধু ঋষি মহারাজকে বলিলেন ধরিতে। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অমর মুখার্জিকে থালা দিয়া ঔষধ লইয়া সাধু সাড়ে দশটায় ফিরিলেন। মহাপুরুষ তখন নিজের ঘরে দরজার পাশে ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সাধু ঔষধ দিয়া বলিলেন, এখন খান। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষুনিই? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ, এক্ষুনিই। তিনি একটা পুরিয়া খুলিয়া ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ গঙ্গার দিকের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। একটি গদি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্বামীজীর ঘরের জানালার সম্মুখে। সামনে খোকা মহারাজ দক্ষিণাস্য আর একটা চেয়ারে বসিয়াছেন। আজ একটু গরম পড়িয়াছে। ক্ষিতীন্দ্র তাই পাখা দিয়া খোকা মহারাজকে হাওয়া করিতেছেন। আর নরসিংবাবু মহাপুরুষকে দিতেছেন পাখার হাওয়া। স্বামী বামদেবানন্দ একখানা গামছা দিয়া বাতাস দিতেছেন মহাপুরুষের মাথায়।

স্বামী ওঁকারানন্দ মহাপুরুষের ডান দিকে রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর একজন সাধু স্বামীজীর ঘর বন্ধ করিয়া প্রথম প্যাসেজে দাঁড়াইলেন, তারপর স্বামী ওঁকারানন্দের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মহাপুরুষ ধ্যান করিতেছেন। শরীর দুর্বল, হার্ট দুর্বল। কিন্তু ধ্যানে বিরতি নাই। ধনুকের মতন বাঁকা হইয়া বসিয়াছেন। শরীর ধনুর মতন হইলেও ধ্যান চাই।

সাধুরা নীরবে এই দেবদৃশ্য দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন — আমাদের শিক্ষার জন্য এই ধ্যান। মুখে না বলিয়া কাজে দেখাইয়া শিক্ষা দিতেছেন। সাধুদের প্রাণ মন শীতল হইয়া যাইতেছে এই সান্নিধ্যে। মন আনন্দে ভরপুর।

বেশী ধ্যান করিলে মাথার রোগ বৃদ্ধি পায় তাই স্বামী ওঁকারানন্দ ঐ অবস্থা হইতে বুত্থিত করিবার জন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

স্বামী ওঁকারানন্দ — দীনেশ (স্বামী নিখিলানন্দ) একটা উত্তর লিখেছে মহেশ ঘোষের article-এর (প্রবন্ধের)।

মহাপুরুষ — কি লিখেছে?

স্বামী ওঁকারানন্দ — মহেশ ঘোষ 'Modern Review'-তে (মডার্ণ রিভিউ-এ) The Gospel of Sri Ramakrishna-এর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের) একটা সমালোচনা লিখেছেন। এক স্থানে আছে 'শক্তি' মানে কি? — না, যে ভুলিয়ে খারাপ পথে মানুষকে নিয়ে যায়। প্রতাপ মজুমদারের লেখা quote (উদ্ধৃত) করেছেন।

মহাপুরুষ (সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ করিয়া) — আহা, কি কথাই বলেছে! ঠাকুর সর্বদা মা-ছাড়া কিছু জানতেন না। সর্বদা তিনি সন্তানভাবে থাকতেন — মুখে সর্বদা 'মা, মা'।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আমি চারটে পার্টেরই[১] ('কথামৃতের') পাতা উল্টে দেখলাম — অচলানন্দ ঠাকুরকে বলেছেন, 'তুমি ওটা (বীরভাব) মান না। তুমি শিবের কলম উল্টে দিতে চাও?' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কি জানি বাপু আমার মাতৃভাব'।

মহাপুরুষ — হাঁ, অচলানন্দের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, ওর একটু হয়েছে, সার আছে। অন্যদের কিছু নাই। কেউ হয়তো কারণ করে টলছে। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে কিংবা বমি করে ফেলেছে। কিন্তু অচলানন্দ জপটপ করছে দেখেছি। ওরা সব বসতো কি না চক্র করে ঠাকুরের সামনে। অচলানন্দ দক্ষিণ দেশের লোক।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আর একটা কথা বলেছেন মহেশ ঘোষ — রামকৃষ্ণ পরমহংস কেবল নাম করতে বলেছেন। আমরা (ব্রাহ্ম সমাজ) ধ্যানের কথা বলি।

মহাপুরুষ (ব্যঙ্গ করে) — আহা, কি অমূল্য কথাই বলছে!

৫

স্বামী ওঁকারানন্দ — 'কথামৃত' থেকেই দেখানো হয়েছে ঠাকুর পূজা পাঠ, জপ ধ্যান, ভাব মহাভাবের কথাও বলেছেন।

---

(১) 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ তখনও বাহির হয় নাই।

স্বামী ওঁকারানন্দ — এই 'মর্ডাণ রিভিউ'তেই অশোক চাটুয্যে লিখেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্টে সাধারণ লোকের কাছে প্রচার করেছেন। সে দেশের intelligentia-র (বুদ্ধিজীবীদের) সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই।' তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জেমস্ (James), রয়েস (Royce) প্রভৃতি ফিলজফার ওঁর লেকচার attend (উপস্থিত থাকতেন) করতেন।[২]

মহাপুরুষ — এদের যেমন বুদ্ধি! দু'পাতা ইংরেজী পড়েছে বই তো নয়। আর কোথায় স্বামীজী! কত বড় একটা spirituality (আধ্যাত্মিক শক্তি)! তাঁর সঙ্গে তুলনা! তাঁর সম্বন্ধে কথা!

মহাপুরুষ তাঁহার ঘরে যাইতেছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, মাথায় কষ্ট হচ্ছে কি? উনি উত্তর করিলেন, হাঁ, গরমের দিনে বিকেলে মাথা একটু গরম হয়।

একটি সাধু ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণও সংসারের সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এমনি মহামায়ার খেলা! সর্বমঙ্গলা ব্রহ্মশক্তিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের সামনে বলা হচ্ছে, শক্তি অমঙ্গলা।

শ্রীম (সহাস্যে) — এটা শুনে ঠাকুরের একটি মহাবাণীর কথা মনে হল। ঠাকুর বলতেন, 'একজন বলেছিল — আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া।' এতেই মনে হয় যে, মামার বাড়িও নাই, গোয়ালও নাই, ঘোড়াও নাই। কারণ গোয়ালে তো গরু থাকে। ঘোড়া থাকে আস্তাবলে।

আর একটি গল্প ঠাকুর বলেছিলেন। একজনের একটা হীরা ছিল। সে ওটাকে বাজারে বেচতে গিয়েছে। বেগুনওয়ালাকে দেখালে। সে বললে, এর দাম নয় সের বেগুন। তারপর কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে গেল। সে

---

(২) বস্তুবাদী দার্শনিক ইন্‌জারসোল, ধনকুবের রকফেলার প্রভৃতি স্বামীজীর সঙ্গে মিশেছেন, কথা কয়েছেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন। হার্ভার্ডের দর্শন বিভাগের একটা স্থায়ী মুখ্য অধ্যাপক হবার প্রস্তাব স্বামীজীর কাছে এসেছিল। হার্ভার্ডের অন্যতম বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর রাইট স্বামীজীর বন্ধু ছিলেন। একটা পরিচয়পত্রে স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'He is more learned than all of us put together' (আমাদের সকলের বিদ্যা একত্র করলেও তার থেকে অধিক বিদ্বান স্বামী বিবেকানন্দ)।

বললে, ন'শো টাকা। পাশের ঘর জহুরীর। সে এটা দেখেই এক লাখ টাকা দাম দিলে। জহুরী চেনে হীরা।

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। আজ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। মহাপুরুষ মহারাজের ঘর। সকাল সাড়ে সাতটা। একটু গরম পড়িয়াছে। অনেক সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, শাশ্বতানন্দ, দেশিকানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, ঢাকার ব্রহ্মচারী মণি, শৈলেশ প্রভৃতি যে যেখানে পারেন দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন।

আমেরিকাবাসী ব্রহ্মচারী কেডুলা (Kadula) আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক ঠাকুরের জন্মতিথিতে।

*Kadula — Maharaj, I want to take the vow of Brahmacharya ceremonially. Pray, grant me that.

Mahaurusha — You are already a Brahmacharin, following the rules. You know them all.

Kadula — No, Maharaj, not all.

Mahapurusha — So, Omkarananda will explain the meaning of them all. Only before a consecrated fire to chant them.

But everything is within. To Pray to Him always — I may not deviate from my vows. Everything is within

---

*কেডুলা — মহারাজ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যব্রত নিতে ইচ্ছা করেছি। আপনি কৃপা করে উহা প্রদান করুন।

মহাপুরুষ — তুমি তো আগে থেকেই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যের সব নিয়ম পালন করছ। ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি সব জান।

কেডুলা — না মহারাজ, সবগুলি জানি না।

মহাপুরুষ — তা, ওঁকারানন্দ ঐ মন্ত্রগুলির অর্থ তোমার নিকট ব্যাখ্যা করবে। কেবলমাত্র পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া ঐ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে — এইটে বাকী।

কিন্তু সবই অন্তরে। ঈশ্বরের কাছে সর্বদা আন্তরিক প্রার্থনা করা — প্রভো,

everything mental.

He is all in all. Sri Ramakrishna is the Paramatman, over-soul, the Lord incarnate. He is all-knowledge, all purity. He is all in all.

একটা সাধু (স্বগত) — আমার মন এই গুরু গম্ভীর বাণী কেবল স্মৃতিবদ্ধ করছে। কই, ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না কেন? হৃদয়ে বদ্ধ করে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে এই মহাবাক্য — 'Sri Ramakrishna is the Paramatman, the over-soul, the Lord incarnate!' (শ্রীরামকৃষ্ণই পরমাত্মা। তিনিই বিশ্বাত্মা। তিনিই পরমেশ্বর — ইদানীং নরকলেবরে অবতীর্ণ)।

বাইরের অবস্থার সংঘর্ষে এই মহাবাণী সর্বদা স্মরণ রাখতে পারছি কই? প্রভো, হৃদয়ে এই বাণীর ধারণা করিয়ে দাও।

শ্রীম — আন্তরিক ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ঠাকুর বলতেন, পিঁপড়ের পায়ের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছায়, আর ভক্তের ডাক পৌঁছাবে না? তাঁর নিবাসস্থল তো অন্তরই — হৃদয়! হৃদয় থেকে বললে নিশ্চয় পৌঁছায়।

৬

একজন সাধু ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

আজ শিবরাত্রি, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সকাল আটটা। শ্রীমহাপুরুষ বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় ধীরে ধীরে বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণ।

বারান্দায় যাইবার সময় প্যাসেজে দরজার রেলিং-এর উপর দিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন বিছানায়। আর যুক্ত করে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, স্বামীজী মহারাজ, দয়া কর। জয় গুরুমহারাজ!

আমি যেন ব্রহ্মচর্যব্রত হতে ভ্রষ্ট না হই। সবই অন্তরের ব্যাপার, সবই মনোমধ্যে।

তিনি সর্বেসর্বা। শ্রীরামকৃষ্ণই পরমাত্মা। তিনিই বিশ্বাত্মা। তিনিই পরমেশ্বরন — নরকলেবরে অবতীর্ণ। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই পবিত্রতার বিগ্রহ। তিনিই সর্বেসর্বা।

বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর ঘরের বারান্দার দরজার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া ভিতর দেখিতেছেন। একটি সাধু বিছানার চাদর, ওয়াড় সব বদলাইতেছেন। ক্যাম্পখাটের বালিশের ওয়াড়টা খুলিয়া আর একটা পরাইতেছেন। ভিতরে একটা ছিন্ন ওয়াড়। উহা দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, ওটা বড় বিশ্রী হয়ে গেছে। বদলালে হয় না?

অতি সুস্পষ্ট ভাবে এই কথা বলিলেন। সেবক উত্তর করিলেন, আজ্ঞে, এটা স্বামীজীর ব্যবহৃত।

তা হলে থাক্, থাক্। তা হলে থাক্ — মহাপুরুষ বলিলেন।

আবার বেড়াইতেছেন। আবার রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই টেবিল-ক্লথটা বেশ হয়েছে, না?

সেবক বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। রাত্রিতে আরও ভাল দেখায়, দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিলে। এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বলিলেন, হাঁ, আরও ভাল দেখায়। কয়দিন হয় মহাপুরুষ এই টেবিল-ক্লথটা দিয়াছেন।

আবার বেড়াইতেছেন। আবার রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করিতেছেন করজোড়ে — স্বামীজী, দয়া কর, শান্তি কর।

একটি সাধু ভাবিতেছেন — মহাপুরুষ মহারাজের কি ভক্তি গুরুভাইয়ের উপর! সত্য সত্যই জীবন্ত স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন এখানে। আর তাঁহার কাছে আমাদের জন্য আর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের ভক্তি মুখের কথা মাত্র। আজ শিবরাত্রি — আমি এই জীবন্ত শিব স্বামীজীকেই পূজা করিব — স্বতন্ত্র পূজা আর এবার করিব না। এ ঘরে আমার যে সেবা, এটা যেন একটা কাজমাত্র। স্বামীজী এখানে জীবন্ত, এই ভাবে তো দেখিতে পারি নাই এত দিন! তাই, সন্তানের অপরাধ নিও না স্বামীজী মহারাজ!

এখন সকাল সাড়ে আটটা। মহাপুরুষ বারান্দায় বসিয়া আছেন চেয়ারে গদির উপর। সামনে গঙ্গা। শৈলেশ রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

শৈলেশ — গিরিজা (পরে স্বামী ধীরেশানন্দ) সন্ন্যাস নিতে এসেছে।

মহাপুরুষ — তা নিয়ে যায় যাক্! ওতে কিছুই হয় না। কাপড়

রঙালে কিছু হয় না। এতে ভিক্ষার সুবিধা হয় মাত্র।

আসল সন্ন্যাস সমাধি। সমাধি না হলে কিছুই হলো না। তাঁ’তে জ্ঞান ভক্তি হলেই সন্ন্যাস। নয়তো, কাপড় পরে কিছুই হয় না।

শৈলেশ — তবে আপনাদের হাত থেকে নিলে একটা সংস্কার হয়।

মহাপুরুষ (অনিচ্ছাসত্ত্বে) — তা হয়।

এইবার কথা উল্টাইয়া দিলেন। নিচে পাচক গোপীনাথ গঙ্গাস্নান করিয়া লনের উপর দিয়া তাহার ঘরে যাইতেছে। মহাপুরুষ দেখিয়া বলিলেন, নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। আজ আবার শিবরাত্রি! গোপীনাথ সঙ্কুচিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

অপরাহ্নে অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। মহাপুরুষ সকলকে লইয়া গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের সামনে ইজি-চেয়ারে, উত্তরাস্য। ভক্তরা সব মেঝেতে বসা।

নিচে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) লনে পায়চারী করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, খোকা বড় রোগা হয়ে গেছে দেখছি।

আজ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। এখন সাতটা। শৈলেশ একটি সত্যনারায়ণের রঙ্গীন পুতুল আনিয়া ঘরে রাখিয়াছেন। দৃষ্টি পড়িতেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুতুল কে এনেছে। শৈলেশ বলিলেন, আমি। মহাপুরুষ বলিলেন, দেখি কার মূর্তি। শৈলেশ উত্তর করিলেন, সত্যনারায়ণের। মহাপুরুষ দাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কত? শৈলেশ বলিলেন, ছ’পয়সা। মহাপুরুষ বিস্ময়ে বলিলেন, অত?

এখন সাড়ে সাতটা। গত রাত্রিতে সাধুরা শিবপূজা করিয়াছেন সারা রাত সারা দিন উপবাসে থাকিয়া। এখন গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে উঠানে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন।

৭

সাধু ব্রহ্মচারীগণ সমস্বরে আহুতি প্রদান করিতেছেন —

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।[১] (গীতা ৪-২৪)

মহাপুরুষ বালকের ন্যায় অবাধ আনন্দ করিতেছেন। চোখ ও মুখে ব্রহ্মানন্দের ছটা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন, ওঁ ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবি — ইত্যাদি।

তারপর বলিতেছেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মদর্শনের পর সর্বত্র ব্রহ্ম, সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আনন্দে ভরপুর ব্রহ্মদ্রষ্টার ভাবে বলিতেছেন —

ওঁ অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতং[২]
অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতং[৩]

ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন —

---

[১] আহুতি দানের স্রুবাদি অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃত আদি হবিও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, হোতা যিনি হোম করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম, এ কর্মদ্বারা ব্রহ্মকেই লাভ করা হইবে। এইরূপ কর্মে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি থাকে, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন।

এখানে ভোজনের সময় নিজ হস্তই হইল স্রুবাদি, হবিস্বরূপ খাদ্যদ্রব্যকে জঠরাগ্নি রূপ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে। ভোক্তজনই হোতা। এই ব্রহ্মরূপ কর্মের দ্বারা ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইবে।

[২] ভৃগু তপস্যা দ্বারা প্রথম বার এইরূপ জানিয়েছিলেন — অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং শেষে অন্নেই বিলীন হয়।

অন্নের নিন্দা কখনও করিবে না। ইহাই ব্রত।

[৩] অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহাও একটি ব্রত।

হা ..... উ, হা..... উ, হা.... উ। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।[৪]

মহাপুরুষ যেন পাঁচ বছরের বালক — আনন্দে আনন্দ-সাগরে উলট-পালট খাইতেছেন। আবার বলিলেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়।

আজ যেন সকল পৃথিবী শিবময়, ব্রহ্মময়।

শৈলেশ পশ্চিমের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিজে সাধুভোজনের সামান্য commentary (ব্যাখ্যা) করিতেছেন। আর মহাপুরুষ আনন্দে পুনরায় বলিতেছেন, জয় গুরুমহারাজ, জয় গুরুমহারাজ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় মা, জয় স্বামীজী! তাঁদের কৃপায় আজ-এ আনন্দধাম।

স্বামী বামদেবানন্দ প্রসাদ পাইয়া ফিরিয়াছেন। এবার মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করিবেন।

একটি সাধুকে মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উপোস কর নি? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। মহাপরুষ বলিলেন, ভাল করেছ, রোগা শরীর।

সন্ধা-আরতি হইয়া গেল। মহাপুরুষ বারান্দায় ছোট ঘরের পাশে বসিয়া আছেন ইজি চেয়ারে গদীর উপর। কোমর বাঁকিয়া ধুনর মত হইয়াছে শরীর। সেবক মতি পায়ে গামছা দিয়া মশা তাড়াইতেছেন বামদেবানন্দ মাথায় মৃদু হাওয়া করিতেছেন।

মহাপুরুষ দেবীসূক্ত আবৃত্তি করিতেছেন সমগ্রটা।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুবিশ্চারাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।*

---

[৪] ক্রমাগত তপস্যা করিয়া ভৃগু ব্রহ্মদর্শন করিলেন। তখন আনন্দে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া বিস্ময়ে এইরপে ব্রহ্মভাবের প্রকাশ করিতেছেন যে... হা... উ, হা...উ, হা...উ। আমিই অন্ন, আমিই অন্ন, আমিই অন্ন। আমিই অন্নের ভোক্তা, আমি অন্নের ভোক্তা, আমি অন্নের ভোক্তা।

*অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাগ্‌দেবী ব্রহ্মদর্শনের পর ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া এইরূপ বলিলেন — আমিই একাদশ রুদ্ররূপে ও অষ্ট বসুরূপে বিচরণ করি। আমিই দ্বাদশ সূর্যরূপে ও সকল দেবগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমিই ইন্দ্র ও অগ্নিদেবকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। অর্থাৎ আমিই সব হয়ে রয়েছি।

মহাপুরুষ বলিলেন, এই হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ। দেবীসূক্ত পাঠ করলেই হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ।

বারান্দায় বিজলী জ্বলিতেছে। গঙ্গার ওপারে জেটিতেও আলোর মালা। মহাপুরুষ ঘরে যাইতেছেন, প্যাসেজে বলিলেন, জগবন্ধু, এবার স্বামীজীর ঘর বন্ধ কর।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — আহা, কি সব সুন্দর কথা। কি দেবদৃশ্য! ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ মহারাজের এই ছোট-খাট কথায় যেন জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস মূর্তি ধারণ করেছে। এতে কত উপকার হবে ভক্তদের! যে লেখে তারই উপকার বেশী। লিখতে লিখতে চিন্তা হয় আর তাতে মনে গেঁথে যায়।

মহাপুরুষের কথাগুলি যেন মুক্তার মালা। আহা, ইনি এই ডায়েরী শোনানোতে আমাদেরও বড় সাধুসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের কৃপা না হলে এসব লিখে রাখার ইচ্ছাই হয় না। ধন্য ইনি! আমরাও ধন্য — এঁর মুখে এসব মঠের জীবন্ত নাটকের বিবরণ শুনে। ঠাকুর এসেছিলেন বলেই এসব সম্ভব — এই জীবন্ত ধর্ম।

বিনয় মহারাজ, জগবন্ধু মহারাজ ও মণীন্দ্র মহারাজ মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইতেছেন। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। শ্রীম জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাত ধুয়েছেন কি? ঠাকুরদের জন্য মিষ্টি নিতে হবে। কি ভাবিয়া তখনই বিনয়ের হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা দিলেন। অনেক মিষ্টি, তাই বলিতেছেন, সাবধানে নিয়ে যেও। জগবন্ধুর হাতে এক ডজন তালপাতার পাখা দিলেন সাধুদের জন্য।

বাগবাজার। স্টীমার ঘাট। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রবোধানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দ স্টীমারের অপেক্ষা করিতেছেন।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ বলিলেন, পাখাগুলি স্বামীজীর ঘরে রেখে দাও। প্রয়োজনমত নেওয়া যাবে। জগবন্ধু মহারাজ স্বামীজীর ঘরের সেবক।

বেলুড় মঠ, কলকাতা।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

অষ্টম অধ্যায়

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা। আজ ১১ই মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। কয়েকদিন পর দোলযাত্রা, ফাল্গুন পূর্ণিমা। এই শুভদিনে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়।

সকাল সাড়ে দশটা। স্বামী জিতাত্মানন্দ ও নিত্যাত্মানন্দ (বিনয় ও জগবন্ধু) শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কয়েকদিন পরই জগবন্ধু দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যাইবেন।

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। শ্রীম অন্তর্মুখ। কিছুক্ষণ পর কথা কহিতেছেন। শ্রীম জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মঠের ডায়েরী এনেছ কি? তাহলে পড়। এ যেন বৈকুণ্ঠের সংবাদ!

সাধু ডায়েরী পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। আজ শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মোৎসব। ২রা মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। তিথিপূজা আগে হইয়াছে। অপরাহ্নে - লনে মিটিং। সভাপতি অনুকূলবাবু। ইনি মুন্সেফ। বক্তা স্বামী বিজয়ানন্দ ও বাসুদেবানন্দ।

শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন ইজিচেয়ারে, স্বামীজীর ঘরের সামনে, উত্তরাস্য। চেয়ারে গদী পাতা। একজন ভক্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উলের পাখার হাওয়া করিতেছেন। সেবক শঙ্কর প্যাসেজের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কপালে সিঁদুরের লম্বা টিপ।

স্বামী বাসুদেবানন্দ বক্তৃতা করিতেছেন। শেষ হইলে মহাপুরুষ হাততালি দিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতেছেন। বলিতেছেন—বা, বা, বাসুদেবানন্দ।

এখন প্রায় পাঁচটা।

কতকগুলি ভক্ত মহিলা আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সামনে

দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন। নিচে অনুকূলবাবু বক্তৃতা করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ৩রা মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সকাল সাড়ে সাতটা। মহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন প্যাসেজের সামনে, উত্তরাস্য। সাধুরা প্রণাম করিতেছেন। ঘরে গিয়া না পাইয়া এখানে আসিয়াছেন।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ দাঁড়াইয়াছেন ছোট ঘরের দেয়ালের গায়ে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া। স্বামী রাঘবানন্দ মহাপুরুষের সামনে। স্বামী অম্বিকানন্দ ও দেশিকানন্দও সামনে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ স্বামীজীর ঘরের জানালার সামনে। ভজহরি (স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ) দাঁড়াইলেন স্বামীজীর ঘরের জানালার পাশে বারান্দায়।

এ-কথা সে-কথার পর বাগবাজারের নূতন মঠের কথা ও স্বামী অভেদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, হোক্ না, খুব হোক্। আরো হোক্। যত হয় ভাল। (সহাস্যে) এখানে (বেলুড় মঠে) এতগুলি (সাধু) হলে ধরবে কোথায়? সব স্থান থেকেই তো তাঁর কথা প্রচার হচ্ছে। খুব ভাল। হোক্ না। এই যে হচ্ছে এ-ও তাঁর ইচ্ছা। আমি তাই ভাবি — এ তাঁরই ইচ্ছা।

তবে এখানে যারা থাকবে তাদের principle-টা (নীতি) ঠিক থাকবে। ত্যাগ, পবিত্রতা, ভজন, পূজা, পাঠ — এই সব এখানে থাকবে। স্বামীজীর আদর্শ এই। পবিত্রতা, একেবারে ত্যাগ — খুব পাঠ, বিদ্যা — খুব থাকবে। আর love (ভালবাসা)। Love-এতে সব হয়। খুব love চাই।

আর যাঁরা আসবেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কথা বলা। (হাতে, চোখমুখে অন্তর ও উপর দেখাইয়া ঈশ্বরের ইঙ্গিত করিলেন) — ঈশ্বরের, ঠাকুরের কথা বলা।

শ্রীম — আহা, কি উচ্চ উদার ভাব! দেখ, যাঁরা ঈশ্বরের নাম প্রচার করবেন তাঁরা সকলেই আপনার লোক। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরই এই দৃষ্টি সম্ভব। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই দলাদলির কথা। কি সুন্দর কথা! সবাই ঠাকুরের নাম প্রচার করছে। আহা কি কথা — যে-ই আসবে তাকেই ঈশ্বরের কথা শোনাবে!

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। গঙ্গার দিকের

দ্বিতলের বারান্দা। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন। চেয়ারে গদী পাতা। আজ পেটের গোলমাল চলিতেছে, তাই খুব ক্লান্ত। বৃদ্ধ শরীর। চেয়ারখানা আজ রাখা হইয়াছে প্যাসেজের বাম দিকে। সম্মুখেই গঙ্গা। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। এক একবার চাহিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন।

স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু দরজা জানালা বন্ধ করিতেছেন। আর এক একবার মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। মহাপুরুষও দেখিতেছেন সেবকের কাজ। খড়খড়ি খোলা রাখা হয়। তাহার ফাঁক দিয়া মহাপুরুষও দেখিতেছেন, সেবকও দেখিতেছেন। হঠাৎ একটু জোরে দরজাটা বন্ধ করা হইল। মহাপুরুষ মহারাজ চকিতে চাহিয়া দেখিতেছেন।

সেবক স্বামীজীর ঘরে ধুপ ও আলো জ্বালাইলেন। ঁদক্ষিণেশ্বরের মা কালী, ঠাকুর ও গঙ্গামাতাকেও ধুপ দেখান হইল। শ্রীমহাপুরুষের চরণযুগলেও ধূপদান হইল। চরণযুগল সমানভাবে মেঝের উপর ভেলভেটের চটিতে রাখা।

সন্ধ্যা হয় হয়। মহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। ধ্যানস্থ নয়ন। সেবক রমেন (স্বামী বামদেবানন্দ) তোয়ালে দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছেন। আর মতি মহারাজ (স্বামী শিবস্বরূপানন্দ) তালপাতার পাখায় মহাপুরুষের পায়ে হাওয়া করিয়া মশা তাড়াইতেছেন।

অদূরে উত্তর দিকে রেলিং-এর পাশে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) মাদুরে বসা তাকিয়া ঠেস দিয়া — দক্ষিণমুখী। একটি সাধু প্যাসেজের মুখে দাঁড়াইয়া উভয়কে দর্শন করিতেছেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে কতকগুলি জলের কুঁজা পাঠাইয়াছে সেই প্রসঙ্গে দেওঘরের সম্বন্ধে এ-কথা সে-কথা চলিতেছে।

স্বামী সুবোধানন্দ —ওঁরা (সরোজ ও গিরিজা মহারাজ) চলে গেছেন দেওঘর?

রমেন — না।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, বিদ্যাপীঠের পোলটা হয়ে গেছে?

রমেন — আজ্ঞে হাঁ।

রমেন বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব কর্মী।

রমেন — দেওঘরে একজন একটা বাঘ পোষে। বাচ্চা বয়স থেকে খাঁচায় রেখে দিয়েছে। কুকুর, শেয়াল, ছাগল — এসব একে খেতে দেয়।

মহাপুরুষ (বিস্মিতভাবে) — ও বাবা, এসব কেন?

ঠাকুরঘরের শঙ্খধ্বনি হইল। মহাপুরুষ ব্যস্তভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। কথাবার্তা সব বন্ধ। ধ্যান করিতেছেন, ইহার পূর্বে ঠাকুর দেবতাদের নাম করিতেছেন — "দুর্গা, দুর্গা, শিবদুর্গা। জয় প্রভু, জয় প্রভু, জয় প্রভু। দুর্গা, শিবদুর্গা।" পৃষ্ঠদেশ ধনুর মত বক্র। তবুও অভ্যাসে নিষ্ঠা।

সম্মুখে গঙ্গা দিয়া সাদা রঙ্গের একখানা জাহাজ যাইতেছে উত্তর দিকে মাথা উঁচু করিয়া, তীরের ন্যায় নির্ভীকভাবে। Tail light-টিতে (পিছনের আলোতে) সাদা রং, আর head light-টি (সামনের আলো) লাল।

ঘাটের পাশ দিয়া সবেগে যাইতেছে একখানা সুরকি-বোঝাই নৌকা, দক্ষিণ দিকে। মাঝিরা সব দাঁড় টানিতেছে। গঙ্গার জল সাদা — জোয়ার আসিয়া গিয়াছে। সুরকিগুলি পাইল-করা, উঁচু। বেশ সুন্দরদর্শন।

ঘাটের উপর দক্ষিণ পাশে লনে কয়েক বস্তা মাল পড়িয়া আছে। কলিকাতার বাজার হইতে আসিয়াছে। উৎসব নিকটবর্তী।

শ্রীমহাপুরুষের শরীরে কষ্ট। কিন্তু তবুও ধ্যানমগ্ন।

শ্রীম — কি সুন্দর বিবরণ! যেন চোখের সামনে এনে সব ধরে দিচ্ছে। শরীর অপটু, বেঁকে ধনুর মত হয়েছে। তথাপি আরতির ঘন্টা পড়তেই ভগবানের নাম করছেন মহাপুরুষ, আর ধ্যানমগ্ন। এতে ভক্তদের বহু কল্যাণ হবে। তারাও অসুখে বা বার্ধক্যে এইরূপ ঈশ্বরচিন্তা করতে চেষ্টা করবে। এ সব object lesson (আদর্শ শিক্ষা)।

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। ৬ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। মহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা। অনেক সাধু ঘরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন — স্বামী ওঁকারানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ, শাশ্বতানন্দ, ভাস্বরানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, শৈলেশ প্রভৃতি।

মিস্টার কেডুলা (Mr. Kadula) প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, What is your name? (তোমার নাক কি?) কেডুলা প্রণামান্তে উত্তর করিলেন সহাস্যে, মঙ্গলচৈতন্য। মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দে বলিলেন, বেশ

নাম। মঙ্গলকে peace (পীস) বলবে? না, তা তো শান্তি। (সকলের প্রতি) মঙ্গলকে কি বলবে? স্বামী শাশ্বতানন্দ বলিলেন, good (গুড — ভাল)। নিত্যাত্মানন্দ বলিলেন, blessedness (ব্লেসেডনেস — পবিত্রতা)। শৈলেশ বলিলেন, auspicious (অস্‌পীশাস্ - শুভ)।

আজ উৎসব, ৮ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। বেলুড় মঠ। সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় উত্তর-দক্ষিণে পায়চারী করিতেছেন। খোকা মহারাজ মহাপুরুষের ঘরের সামনের রেলিং-এর পাশে ইজি-চেয়ারে বসা, দক্ষিণাস্য। মহাপুরুষ উত্তরের দিকে ছাদে যাওয়ার দরজার কাছে। আবার ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে প্যাসেজের কাছে আসিলেন।

অনেক সাধু, ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন এদিক সেদিক — বিনয়, শৈলেশ, দেবানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, ভজহরি প্রভৃতি। স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, ওঁ নমো নারায়ণায়। উনি কোন প্রত্যুত্তর না করায় স্বামী দেবানন্দ বলিলেন, আপনি কিছু বললেন না? তবুও ধ্রুবেশ্বরানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ ততক্ষণ উত্তর প্রান্তে। দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, একবার বড় মজা হয়েছিল, অনেক দিন আগে, আলমোড়ায়। একজন সাধু আমাকে 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলেছিলেন। আমি উত্তর করেছিলাম, 'নারায়ণ'। সাধু খুব চটে গিয়ে বললেন — কি, আমি তোমায় ওঁ নমো নারায়ণ, বললাম। আর তুমি কি না বললে, নারায়ণ। আমি বললাম, কি বলতে হয়? উনি বললেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলতে হয়। আমি তখন বলি — হাঁ, তাই বলছি। আমি জানি না। তখন খুব খুশী।

শ্রীমহাপুরুষ শিশুর মত 'হি হি' করিয়া হাসিতে লাগিলেন হাত নাড়াইয়া।

আজ এগারটার সময় শ্রীম মঠে আসিয়াছেন। স্বামীজীর মন্দিরের কাছে, দর্শনান্তে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইতেছেন জোর করিয়া অন্তেবাসী। সঙ্গে অমূল্য ও সুধীর। বিনয় মহারাজ ও গদাধর মহারাজও আসিয়া উপস্থিত।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — খুব graphic (ছবির মত)। লিখতে লিখতে লেখার কৌশল বেড়ে যায়। লোকের সামনে দূরের ঘটনা জীবন্ত করে আনা যায়।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসা। শ্রীম-র সামনে বেঞ্চে বসা একটি নূতন ভক্ত। বেশ লম্বা চওড়া শক্ত চেহারা। বিলাতফেরৎ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বর্ধমান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কথাবার্তা হইতেছে কুশল প্রশ্নাদির পর। বিনয় মহারাজ ও জগবন্ধু মহারাজ প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। অমৃতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ আছে কোনও বৈষয়িক বিষয়ে। একজন আম-মোক্তারী দিবেন অপর আর একজনকে।

শ্রীম সাধুদের জোড়া বেঞ্চিতে আসনের উপর বসাইলেন আহ্বান করিয়া — আসুন, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। (প্রিন্সিপ্যালের প্রতি) এই দর্শন করুন সাধু। এঁরা সব ছেড়েছেন ঈশ্বরের জন্য। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন। Wholetime man. Amateurs in religion নন — সারা জীবনের জন্য ব্রতী, সখের ধর্ম নয়। Serious life (অতি কঠিন জীবন) নিয়েছেন।

প্রিন্সিপ্যালের মনে এ কথা ভাল লাগে নাই।

প্রিন্সিপ্যাল (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলুন। তাঁর কথা শুনতে এসেছি।

শ্রীম — বা, আপনি তো ভক্ত লোক! তাঁর কথা শুনবেন? তাঁর প্রথম কথা — সাধুসঙ্গ। দ্বিতীয় কথা — সাধুসঙ্গ। শেষ কথা — সাধুসঙ্গ। এক কথায় তাঁর সমস্ত উপদেশ বলতে হলে বলতে হয় — সাধুসঙ্গ।

ঠাকুর কি শুধু কথা শোনাতেন? — তা নয়। তিনি মানুষ তৈরী করতেন। বলতেন, বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। কেবল মুখে বললে কি হবে? তেমনি ঈশ্বরীয় কথা। ঈশ্বরীয় কথা শুনলে পালন করা উচিত। নইলে তাঁর আস্বাদ লাগবে না। সেই আস্বাদ পাওয়া যায় সাধুসঙ্গ করলে। সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা। কেন? না, তাঁরা যে বাজনার বোল হাতে আনতে চেষ্টা করছেন। সব ছেড়ে তাঁ'তে মন দেবার জন্য আপ্রাণ খাটছেন। তাই তাঁদের সঙ্গ করলে তাঁরা যা করেন তাই করতে ইচ্ছা হবে। তাইতো তিনি এসে সাধু তৈরী করেছেন। সাধু ছাড়া ঈশ্বরীয় শিক্ষা কেন, কোন শিক্ষাই worth the name (নামের যোগ্য) হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার

এটি মূলস্তম্ভ। সর্বত্যাগী ঋষিগণ এই দেশের সমাজ, সভ্যতা রচনা করেছেন এই ভিত্তির ওপর।

সব ছাড়া কি চারটি খানিক কথা? সংসারের ভোগবাসনা থাকলে ছাড়তে পারে না। হয়তো, একটা ভিটেমাত্র আছে, তবুও ছাড়া যায় না। যাদের মনে কর সব আছে, বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান সব আছে, তাদের পক্ষে সব ছাড়া কি ছেলেখেলা? বহুজন্মের চেষ্টায় এটি হয়।

ক্রাইস্টের কাছে একজন বড়লোক ভক্ত গেছেন। বললেন, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? (St. Mark 10:17) (আমি আপনার কাছে থাকতে চাই প্রভো)। ক্রাইস্ট তখন বললেন, তুমি কি কর? সে বললে, আমি ten commandments (দশ নীতি) পালন করি। তখন তিনি বললেন, বা তুমি তো বেশ লোক! তবে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি তোমার নেই। সেটা করে ফেল। বললেন, 'Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor ... take the cross, and follow me.' (St. Mark 10:21) (বাড়ি যাও, সব বিক্রি করে ফেল। আর ঐ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর। তারপর স্কন্ধে ক্রুশটি রাখ। তারপর আমার সঙ্গ নাও) 'Take the cross' মানে মৃত্যুকে বরণ করা। ভক্তটি ঐ কথা শুনে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। পারলে না সব ছাড়তে, মৃত্যু বরণ করতে। ঘরে ফিরে গেল। এমনি কঠিন ত্যাগ! ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না। বেদে আছে, “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ।’

তাই ঠাকুর বলতেন — সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ। এ বই উপায় নাই। যেমন উকীলের সঙ্গ করলে, সেবা করলে উকীল হওয়া যায়, তেমনি সাধুর সঙ্গ ও সেবা করলে ঈশ্বরকে জানা যায়। সাধুরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করার সূত্র। তাঁদের bypass (ত্যাগ) করে ধর্ম হয় না।

এই ত্যাগ নেই বলে আজকাল স্কুল কলেজের পড়ায় কিছু হচ্ছে না। চরিত্র গঠিত মোটেই হচ্ছে না। যারা পড়াবে তাদেরই আদপে শিক্ষা নেই, কি পড়াবে তা হলে? এই যে হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট তৈরী হচ্ছে তার ফল কি হচ্ছে? Culture (সংস্কৃতি) হচ্ছে কি? কিছুই না। কতগুলি information (তথ্য) জানার নাম শিক্ষা নয়। মানুষের ভেতর যে পূর্ণতা

রয়েছে সেটাকে ব্যবহারে আনা। মানুষের স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ কি না! সেই জ্ঞানটিকে বাইরে আনা। একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর্শ না রাখলে বাইরের জ্ঞানলাভ মানুষকে শান্তি সুখ দিতে পারে না। মানুষের চরিত্র Himalayan basis-এর (হিমালয়রূপ সুদৃঢ় ভিত্তির) উপর খাড়া থাকতে পারে না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর মনোবিজ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তার অনুশীলন হয়েছে। তারপর জড়বিজ্ঞান। স্থূল জগতের নানাবিষয়ক জ্ঞান। West (প্রতীচী) এই জড় বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান জানে না বলে এতো জেনেও ফল কুফল হচ্ছে। চরিত্র গঠিত হয় না। মনে শক্তি নাই। হিংসা দ্বেষ দিন দিন বাড়ছে।

একজন গ্র্যাজুয়েটকে জিজ্ঞাসা করা হলো, Geography-র (ভূগোলের) elementary question (অতি সাধারণ প্রশ্ন)। সে বললে, আমার Geography (ভূগোল) ছিল না। ইংলিশও জানে না। ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। এই সব productions (তৈরী মাল) দেখে যারা পড়ায় তাদের মুরোদ বোঝা যায়।

ক্রাইস্ট কি লেখাপড়া জানতেন? ঠাকুর কি লেখাপড়া জানতেন? নিজের চোখে দেখেছি, যাদের সারা দুনিয়া মানতো পণ্ডিত বলে, সে সব লোক পায়ের কাছে নিচে বসে আছে হাতজোড় করে। আর ক্রাইস্ট? তাঁরও তাই। বড় বড় ‘doctors' (ডক্টররা) মানে, পণ্ডিতরা ভয়ে জড় সড় হয়ে গিছলো। বিস্ময়ে বলেছিল, Is not this carpenter's son? (St. Matth. 13:55) He knoweth no letters. But never man spake like this one. He speaketh like one in authority! (ইনি কি সূত্রধর জোসেফের পুত্র? নিরক্ষর হয়ে এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলো? আমরা তো এমন গভীর জ্ঞানের কথা কোথাও শুনি নাই)!

তাই সাধুসঙ্গ দরকার । সাধুসঙ্গ করলে নিজের মূল্য বোঝা যায়। তখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়। শুধু বিদ্যায় কিছু হয় না। উল্টো ফল হয়। নিজের ও অপরের সুখ শান্তি লাভ হয় না, বরং বিনাশের পথ আরো প্রশস্ত হয়।

তাই ঋষিরা ঈশ্বরকে, মোক্ষকে সামনে রেখে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ জেনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে নানাবিধ শিক্ষা দিতেন।

বেদে দু'টি typical case-এর (আদর্শ ঘটনার) কথা আছে। মহাবিদ্বান

ছিলেন কুলপতি শৌনক আর নারদ। যাবতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও চিত্তে শান্তি ছিল না তাঁদের। তাই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর তখন শান্ত হন। তখনই নিজের ও সমাজের কল্যাণকর হলেন যথার্থরূপে। শৌনক ছিলেন নৈমিষ্যারণ্য University-র Chancellor (বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি)। মহাশাল বলা হতো তাঁকে। দশ হাজার ছাত্র যাঁর অধীনে থাকতো তাঁকেই এই উপাধি দেওয়া হতো। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর তাঁর যথার্থ শান্তি হল!

যে ব্রহ্মবিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী কেবল সে-ই পারে শিক্ষক হতে ঠিক ঠিক। লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া কি কম শক্ত! যে যে বিষয় নিয়েছে — মনন করতে করতে তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে তবে সে বিদ্যা লাভ হয়। Invention or discovery (নূতন যন্ত্র অথবা নূতন সত্য আবিষ্কার) যারা করে তাদের এত concentration-এর (একাগ্রতার) দরকার। একশ' গুণ নিজের জানা থাকলে অপরকে কিছু দেওয়া যায়।

ক্রাইস্টের তো লৌকিক বিদ্যা জানা ছিল না। কিন্তু, দেখ না, তাঁর monument — St. Paul Cathedral, (বিজয়স্তম্ভ — সেন্ট পল ক্যাথিড্রল) কত বিদ্যার ফল এটি! এটিতে কি শিক্ষা হচ্ছে ? লৌকিক বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার দাসী, চরণাশ্রিতা সেবিকা।

প্রিন্সিপাল বিদায় হইলেন।

শ্রীম (একজন সন্ন্যাসীর প্রতি) — ইনি প্রিন্সিপাল, তাই গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে দিলুম। ঠাকুর বলতেন, হেগো গুরুর পেদো শিষ্য। তাই হচ্ছে আজকাল স্কুল কলেজের শিক্ষায়।

সন্ধ্যার পর শ্রীম সিঁড়ির ঘরে গিয়া বসিলেন। পূর্বের চেয়ারে। অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। কথায় কথায় কর্মের কথা উঠিয়াছে — কোন্ কর্মে ঈশ্বরদর্শন হয়?

শ্রীম — গুরূপদিষ্ট কর্ম করতে হবে। অন্য কর্ম করলে জড়িয়ে যাবে। গুরু যা বলেন তাই নিষ্কামভাবে করবার চেষ্টা করা। ঈশ্বরের জন্য কর্ম করাও নিষ্কাম কর্ম। বড় কঠিন নিষ্কাম কর্ম! তাই ভরসা দিয়েছেন ভগবান গীতায়, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' একটু করলেই কাজ হয়ে যাবে, মৃত্যুঞ্জয় হবে। মানে, ভগবান জানেন জীব দুর্বল। তবুও যদি

সাহস করে একটু করতে চেষ্টা করে নিষ্কাম কর্ম, তা হলেই তিনি প্রীত হয়ে মুক্তি দিয়ে দেন। এই ভরসা।

নিষ্কাম কর্মে নিজেরও চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি। আবার এতে অপরেরও কল্যাণ হয়। গুরূপদিষ্ট কর্ম চাই। নিজে নিজে হয় না। গুরুর শরণাগত হয়ে করা চাই।

লোকশিক্ষা বড় কঠিন। ভগবানের ইচ্ছা হলে তবে হয়। মানুষের ইচ্ছায় লোকের শিক্ষা হতে পারে না। তাইতো পণ্ডিত শশধরকে ডেকে বলে দিলেন, তুমি কি চাপরাশ পেয়েছো যে লোকশিক্ষা দিচ্ছ ? তা নইলে কেউ শুনবে না তোমার কথা। চাপরাশ মানে commission (আদেশ)! ভগবান সাক্ষাৎকার ক'রে, তাঁর আদেশ হলে তখন শক্তি হয়। সে ব্যক্তির কথা শুনে জগৎ স্তম্ভিত হয়।

৩

কলিকাতা। বেচু চ্যাটার্জীর স্ট্রীট। রাজপথ। দুইটি সাধু চলিতেছেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। শ্রীমকে দর্শন করিবেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। পূর্বমুখী রাস্তায় বাঁ দিকে একটি জলের কলে একজন সাধু হাত ধুইতেছেন — হেয়ার প্রেসের সামনে। এখানে পূর্বে খোলার ঘর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে প্রথম বয়সে থাকিতেন। ঝামাপুকুর এই মহল্লার প্রাচীন নাম। রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার পূজারী ছিলেন কিছুকাল। এই রাস্তায় ঝামাপুকুর লেনের মোড়ে অপর একটি খোলার ঘরে সংস্কৃত টোল ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

সাধু দুইটি হইলেন বিনয় ও জগবন্ধু। ইঁহারা শ্রীম-র কৃপা দীর্ঘ দিন ধরিয়া পাইয়া আসিতেছেন। জগবন্ধু শীঘ্রই বৈদ্যনাথধাম যাইবেন কর্ম নিয়া — শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। তাই তিনি শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আজ ফাল্গুন-পূর্ণিমা। দোলযাত্রা। আবার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। এই শুভ দিনে সাধুরা যাইতেছেন শ্রীম-র চরণ দর্শন করিতে। মনে খুব আগ্রহ।

একজন সাধু কলে হাত ধুইতেছেন। পূর্ব দিকে ফিরিয়া দেখেন, শ্রীম পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন সহাস্যবদনে। শ্রীম-র আগে চলিতেছে বলাই, সঙ্গে সুখেন্দু। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা।

সাধুদের দেখিয়াই শ্রীম আনন্দে বলিলেন, যান আপনারা গিয়ে (মর্টনের) ছাদে বসুন হাওয়ায়। আমরা ঠাকুর বাড়ি হয়ে ফিরছি।

সাধুরা ভক্তসঙ্গে ছাদে বসিয়া আছেন। শ্রীম ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়। দোতলার বারান্দার পূর্ব ধারের চেয়ারে এখন বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। ভক্তরাও কেহ কেহ উপবিষ্ট। একজন সেবককে বলিলেন, ছাদে মঠের সাধুরা বসে আছেন। এখানে নিয়ে আসুন ডেকে।

সাধুরা আসিয়া শ্রীম-র পাশে বসিলেন। তাঁহাদের হাতে সন্দেশ দিলেন নিজহস্তে। সাধুরা সন্দেশ হাতে রাখিয়া শ্রীম-র কথা শুনিতে ব্যগ্র। শ্রীম বলিলেন, খেয়ে ফেলুন। প্রসাদ 'প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্ষয়েৎ।' মানে, দুর্লভ জিনিস! যদি বিঘ্ন হয় খাওয়ায়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন ভগবান, তাকে বলে প্রসাদ। তাই প্রসাদ চেয়ে নিতে হয়। অন্য জিনিস অপ্রতিগ্রহ। কিন্তু প্রসাদের বেলায় তা নয়। দীনভাবে তা চেয়ে নিতে হয়। নিজের কল্যাণ কি না! এতে জীব মুক্ত হয়।

জগবন্ধু — আগামী পরশু আমি বৈদ্যনাথধামে যাচ্ছি বিদ্যাপীঠে। সুরপতি নিয়ে যাবেন। তিনি আজকাল এর অধ্যক্ষ।

শ্রীম — কে সুরপতি?

জগবন্ধু — এখনকার নাম বোধাত্মানন্দ। সাধু হওয়ার পূর্বে এখানে আসতেন বৌবাজার থেকে। কালও এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন।

শ্রীম (নয়নহাস্যে) — (সুরপতি) আমায় বললেন, 'ঠাকুরের কথা বলুন (হাস্য)। আমি বললাম, র'সো ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বললাম ঠাকুরের একটি সিন্। চাঁচর সেদিন। কাশীপুর বাগান। ঠাকুর বললেন নরেন্দ্রকে, হৃদয়ে হাত দিয়ে — আঙ্গুল দিয়ে চারদিকের সব দেখিয়ে ইঙ্গিতে। বললেন, 'বল্ তো কি বললাম?' সে বললে, 'অর্থাৎ আপনার ভেতর থেকে সব বের হয়েছে, সারা বিশ্ব'। তখন ভারি খুশি হয়ে রাখালকে বললেন, 'দেখলে কেমন বুঝছে আজকাল।' আগে অবতার মানতো না কি না। এখন বুঝেছে। তাই ঠাকুরের অত আনন্দ।

গীতায়ও ভগবান বলছেন এই কথাই ঃ

‘মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।’ (গীতা ৭-৭)*

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাজার ভাষ্য পড়, টীকা কর, টিপ্পনী দেখ, আর শাস্ত্র পড় — এ আলাদা জিনিস। এটার এই অর্থ, ওটার ঐ অর্থ — এসব দেখে শাস্ত্রেতে। তিনি বলতেন তাঁর যদি একটি রশ্মি কেউ পায়, তবে তার কণ্ঠে সরস্বতী বাস করেন।

তিনি বলেছিলেন, গোপীদের ভালবাসার যদি এক কণাও কেউ পায় তবে হেউ ঢেউ হয়ে যায়। মন বুদ্ধি সেখানে যেতে পারে না — ফিরে আসে। তাই বেদে আছে — ‘যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।’

অত দুর্লভ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম মানুষ হয়ে এসেছেন। যুগে যুগে আসেন। এবার এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে। বিশ্বাস হয় কোথায়, বললেই? তাই অত আনন্দ নরেন্দ্র যখন বললে, আপনা থেকে এই বিশ্ব এসেছে।

Intellectually (বুদ্ধি দ্বারা) বুঝলে হয় না, ধারণা হয় না। কেন? ভাণ্ড ছোট। তিনি না বোঝালে বুঝবার যো নাই। নরেন্দ্রকে বুঝিয়েছেন। তাই নরেন্দ্র ঐ কথা বললেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্ত অভয়বাবু আসিয়াছেন। আর একটি ভক্ত — ডিস্‌পেপ্‌টিক। তিনি আফিস হইতে ফেরৎ পথে আসিয়াছেন। চোগা চাপকান পরনে। হাতে প্রসাদ আনিয়াছেন।

জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝলমল করিতেছে। শ্রীম বলিলেন, এখন ন’টা বেজে গেছে। সাধুদের বলছেন, এবার আপনারা উঠুন। অনেক দূর যাবেন।

সাধুরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ললিত ও ছোট অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে দাঁড়াইয়া সাধুদের বিদায় দিলেন। পায়ে দুইজনে দুইটি টাকা দিলেন।

বেলুড় মঠ,
১৪ মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

---

* হে ধনঞ্জয়, আমাকে ছাড়া অন্য কিছুই নাই এ জগতে। যেমন একটা সূত্রে অনেক রকমের মণি গ্রথিত থাকে তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতে (সূত্রাত্মাতে) সংগ্রথিত।